কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬১

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :
সুখেন গুপ্ত

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
চয়নিকা প্রেস
বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এ লেখকেরই অন্যান্য বই

ছোট গল্প

অসমতল
হলদে বাড়ি
উল্টোরথ
পতাকা
চড়াই উৎরাই
শ্রেষ্ঠ গল্প
কাঠ গোলাপ
অসবর্ণা
ধূপকাঠি
মলাটের রঙ
দীপান্বিতা
রূপালী রেখা
একূল ওকূল
ওপাশের দরজা
বসন্তপঞ্চম

উপন্যাস

দ্বীপপুঞ্জ
অক্ষরে অক্ষরে
দেহমন
দূরভাষিণী
সঙ্গিনী
গোধূলি
চেনামহল
অনুরাগিণী
সহৃদয়া
শুক্লপক্ষ

কবিতা

নিরিবিলি

বেনেপুকুর লেনের নোনাধরা পুরনো একতলা বাড়িটায় ক-দিন হল বড় খুশির জোয়ার লেগেছে। অজিত সরকারের ছোট বোন শীলার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে সতেরোই ফাল্গুন। মাঝখানে মাত্র আর দিন দশেক বাকি। পাত্রপক্ষ এবার পাকা দেখা সেরে আশীর্বাদ করে যাবেন, তারপর নিমন্ত্রণের চিঠিপত্র ছাপতে দেওয়া হবে। ও পক্ষের তো তৈরী হওয়ার বেশি কিছু নেই। কিন্তু কন্যাপক্ষের আয়োজন-অনুষ্ঠানের এখনো অনেক বাকি আছে। বলতে গেলে কাজ-কর্ম এখন পর্যন্ত শুরুই হয় নি।

সকাল বেলায় চায়ের বৈঠকে এই নিয়ে অজিতের মা নিরুপমা ছেলেকে তিরস্কার করছিলেন। এই পারিবারিক চা-চক্রে বাড়ির সবাই এখন হাজির। অজিত, তার স্ত্রী জ্যোৎস্না, পাঁচ বছরের মেয়ে টুকু, তিন বছরের ছেলে টাটু, অজিতের ছোট ভাই সন্তু, নন্তু সবাই চা খাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। ঘরের মেঝেয় পুরনো একখানা শতরঞ্চি ভাঁজ করে পাতা। তার ওপর ছোটবড় চা-পায়ীরা সার বেঁধে বসে গেছে। তাদের সামনে বসে জ্যোৎস্না বড় একটা কৌটা থেকে বাটিতে বাটিতে মুড়ি নামিয়ে রাখছে। আর শীলা কেটলি থেকে চা ঢালছে প্রত্যেকের কাপে। একটি কাপ অজিতের দিকে এগিয়ে দিতেই টাটু অধীর হয়ে বলে উঠল, ও পিসী, আমাকে বড় কাপ দাও।'

নিরুপমা নাতিকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ তা দেবে না! বড় কাপ কেন, একেবারে কেটলিসুদ্ধ খেয়ে ফেল তুমি।' তারপর ছেলের

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তোদের আক্কেলখানা কি বল তো। নিজেরা তো এক-একটি চা-খোর হয়েইছিস আবার ওই বাচ্চা ছেলেটাকেও চা ধরালি।'

অজিত কোন জবাব দিল না। তার পক্ষ থেকে জ্যোৎস্না মৃদু হেসে বলল, 'কি করব মা, না দিলে যে সারা বাড়ি মাথায় করে তোলে।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'ওর কাপে চা তেমন নেই, দুধই বেশি করে দিয়েছি।' নিরুপমা বোধ হয় কথাটা শুনতে পেলেন না। তেমনি অপ্রসন্ন মুখে বললেন 'তোমাদের যা খুশি তাই দাও। আমার কোন কথাটাই বা শোন তোমরা ?'

এরপর ফের বিয়ের আলোচনা উঠল। নিরুপমা ছেলের দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, 'আচ্ছা অজিত তুই কি এমনি হাতপা কোলে করে চুপচাপ বসে থাকবি ? বিয়েটা কি তোর বোনের না আর কারো ? আজ পর্যন্ত তুই একবার স্যাকরার বাড়ি যেতে পারলিনে। যার ঘাড়ের ওপর একটা বিয়ে সে যে কী করে এমন নিশ্চিন্তে চুপচাপ বসে থাকতে পারে আমি বুঝিনে। এমন কাণ্ড আমি বাপ্ বাপের জন্মেও দেখি নি।'

অজিত কাপে একটু চুমুক দিয়ে সেটি নামিয়ে রেখে হেসে বলল, 'ভেব না মা, এ তো তোমার সেই রেণু-রমার ঘটকালি-করা বিয়ে নয় যে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। এর নাম লাভ ম্যারেজ। যাদের বিয়ে এতে তারাই উদ্যোগী হয়ে সব সামলে নেবে। আমরা পাত পেতে নেমন্তন্ন খাব।'

স্বামীর এ কথা শুনে জ্যোৎস্না মুখ টিপে হাসলে। সন্তু-নন্তু একেবারে ছোট নয়। একজনের বয়স চোদ্দ, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে ; আর-একজনের বার, সে ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। তারাও মুখ মুচকে

হাসতে লাগল। আর ওদিকে লজ্জায় শীলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চা ঢালা বন্ধ রেখে সে প্রতিবাদের স্বরে বলল, 'দাদা!'

নিরুপমা হাসি চেপে শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, 'সত্যি তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেল অজিত? লঘুগুরু কিছু মানবিনে? ছোট বোনকে নিয়ে এসব ঠাট্টা-তামাসা কি তোর করা উচিত? তাও দু-এক বছরের নয়, শীলা তোর চেয়ে ঠিক দশটি বছরের ছোট। সাধে ছোট ভাইবোনেরা তোকে মানে না, ভয় করে না?'

শীলা ছোট ভাইটিকে একটু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমরা চুপ করে কেন বসে আছ সন্তু-নন্তু? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে পড়তে বস গিয়ে যাও।'

নন্তু বলল, 'বিয়েটা হয়ে যাক, তার পরে পড়ব ছোড়দি, বিয়েবাড়িতে কি পড়ায় তেমন মন লাগে।'

শীলা ধমক দিয়ে বলল, 'থাক, তোমায় পাকামো করতে হবে না, ভারি বাহাদুর ছেলে হয়েছে।'

শীলা নিজের চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিছন থেকে সন্তু-নন্তু দুজনেরই হাসির শব্দ শোনা গেল। শীলা ভারি কড়া দিদি। আগেকার দিন হলে এই বেয়াদপির জন্যে দু ভাইকে কান মলে দিত। কিন্তু ওদের এই প্রগলভতায় আজ যেন যথেষ্ট পরিমাণ রাগ নিজের মনে জমে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে যদি ধমক দেয় শীলা গলার স্বরে হয়তো তেমন গাম্ভীর্য আসবে না। ধমকের ওজনটা হয়তো খুবই হালকা হয়ে পড়বে, তাই সে চেষ্টা না করে শীলা সামনের বারান্দাটুকু পার হয়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকল।

এ ঘর সংখ্যায় একখানি হলেও এর ব্যবহার তিন-চার রকমের। পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একখানা টেবিল। তার ওপর ফুল-

কলেজের বই স্তূপীকৃত। খান তিনেক পুরনো চেয়ার—দুখানা টিনের আর একখানা কাঠের। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোট একখানা তক্তপোশ। তার ওপর বইখাতার রাশ ছড়ানো। দেখেই বোঝা যায় তিন ভাইবোনের এটি পড়ার ঘর। অজিতের বন্ধুরা এলে তাদেরও এই ঘরেই বসিয়ে চা দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়। রাত্রে এ ঘরের চেহারা পালটে যায়। বইপত্র সরিয়ে রেখে তক্তপোশে নিজের বিছানা পাতে শীলা। টুকু কোনদিন পিসীর কাছে শোয়, কোনদিন বা ঠাকুরমার কাছে। মেঝেয় বাকি যেটুকু জায়গা থাকে তা জুড়ে ঢালা বিছানা পড়ে। নিরুপমা দুই ছেলে আর নাতনীকে নিয়ে এখানে ঘুমোন। পাশের ঘরটি দাদা-বউদির। কিন্তু দম্পতীর শোবার ঘর বলে সে ঘরেরও রেহাই নেই। সংসারের বাক্স-পেঁটরা হাঁড়িকুড়িতে সে ঘরও ঠাসা। তাছাড়া সকাল-বিকালের চায়ের আসর সে ঘরে বসে। এক সঙ্গে তিনজনকে খেতে দিতে হয়। রান্নার ঘরটি ছোট। সেখানে রান্নাটা সেরে একজন কি বড় জোর দুজনকে খেতে দেওয়া যায়—তার বেশি কাজ চলে না।

এতগুলি মানুষের পক্ষে এই দুখানা ঘর আর একচিলতে বারান্দা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আরো জায়গার দরকার। কিন্তু কোত্থেকে জুটবে। এই দুখানা ঘরের ভাড়াই পঁয়তাল্লিশ টাকা। লাইট চার্জ দিয়ে পঞ্চাশই প্রায় পড়ে। অজিতের দুশো টাকা মাইনে থেকে এর বেশি বাড়িভাড়া চলে না। ভাড়ার জন্যে এই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু মাথা তো কোন জায়গায় গুঁজতেই হবে। অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টাচরিত্রের ফলে এই বাড়ি মিলেছে।

এদিক থেকে সুকুমারদের ভাগ্য ভালো। তারাও পঞ্চাশ টাকাই বাড়িভাড়া দেয়। তবে তাদের জায়গা এত অল্প নয়। গোবরা

রোডের উপর পুরো দোতলা একটি বাড়ি। রান্নাঘর বাথরুম ছাড়া শোবার ঘরই চারখানা। দাঙ্গার ঠিক পরেই বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার খুব সস্তায় পেয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ভারি হিংসা হত শীলার। এখন আর হয় না। সুকুমারের সব রকম সৌভাগ্যের অংশভাগিনী হতে যাচ্ছে শীলা। হিংসা হবে কেন।

দাদার একটু আগের কথাটা শীলার মনে পড়ল। তা বলতে গেলে ঘটনাটা ওইরকমই। শীলার বড় দুই বোনের মত এ বিয়ে হচ্ছে না। জানা নেই, শোনা নেই দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই আচমকা এমন কোন পুরুষের ঘরে গিয়ে উঠতে হবে না শীলাকে। যার ঘরে যাবে, সতেরোই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় যার হাতে হাত চোখে চোখ সে রাখবে তাকে শীলা আজ তিন বছর ধরে জানে। তার স্বভাব প্রকৃতি রুচি রীতি আকাঙ্ক্ষা আদর্শের সঙ্গে একটু একটু করে শীলার দীর্ঘদিন ধরে পরিচয় হয়েছে। নোয়াখালির সেই সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতায় আসবার পর কত যুবককেই তো সে দেখেছে। কেউ বা দাদার কলেজের বন্ধু, কেউ বা অফিসের সহকর্মী। প্রত্যেকেই বিদ্বান বুদ্ধিমান। কিন্তু কেউ সুকুমার দত্তের মত নয়। ওর চেয়ে রূপবান পুরুষ আছে, গুণবান অর্থবানেরও অভাব নেই। কিন্তু কোন যুবকের কথা মনে হলেই মাত্র একজনের চেহারাই শীলার চোখের সামনে ভাসে। তার গায়ের রঙ শ্যাম, ছিপছিপে চেহারা, টানা টানা বড় বড় কালো দুটি চোখ বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল, তার মুখের ভঙ্গিতে চটুলতা নেই, ভাষায় তরল প্রগলভতা কোনদিন প্রকাশ পায় নি! বয়সে যুবক কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ এমন একটি সংযতবাক, মার্জিতরুচি, গভীর-গম্ভীর পুরুষকেই যেন শীলা যুগ যুগ ধরে চেয়ে এসেছে। সুকুমারকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন তার পছন্দ হয় নি, পছন্দ হবে না।

প্রেমজ বিবাহই বটে। কিন্তু পাড়ায় যা রটে গেছে, বাড়িতে দাদা বউদি যে ধরনের ঠাট্টা-তামাসা শুরু করেছেন ব্যাপারটা গোড়া থেকে ঠিক তেমন ঘটে নি। সত্যি বলতে কি, সুকুমারের সঙ্গে শীলার আলাপ-পরিচয় হয় অনেক পরে। আলাপ প্রথমে হয়েছিল সুকুমারের মা বিমলপ্রভার সঙ্গে। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন তিনিই শীলাকে ডেকে নিয়ে আলাপ করেছিলেন। অবশ্য সেই বছরই শীলা স্কুলের গণ্ডী ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকেছে। তবু স্কুলের সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে হেডমিস্ট্রেস তাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। শুধু প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবেই নয়, ক্লাসের ফার্স্ট প্রাইজও শীলার প্রাপ্য ছিল। তবু ওর মনে তেমন আনন্দ ছিল না। ক্লাসের ফার্স্ট প্রাইজটি সে স্কুল থেকে বছর-বছরই পাচ্ছিল। তাতে তেমন কিছু নতুনত্ব নেই। কিন্তু হেডমিস্ট্রেস কি অন্য টীচাররা শীলাকে দিয়ে যা আশা করেছিলেন তা সে করতে পারে নি। মাট্রিকুলেশনে কোন বৃত্তি সে পায় নি। শুধু গোটা দুই লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে গেছে।

আশ্চর্য, স্কুলে গিয়ে দেখল হেড মিস্ট্রেসের কাছে তখনও তার সমাদরের অভাব হয় নি। তিনি সস্নেহে তাকে কাছে ডাকলেন, কলেজের পড়াশুনো আর বাড়ির সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর বান্ধবী বিমলপ্রভা দত্তের সঙ্গে। তাঁর একটি মেয়ে এই স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ে। সেই সূত্রে তিনি মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন যান। হেড মিস্ট্রেসের ঘরে শীলা তাঁকে আরো দু-তিনবার দেখেছে। বেশ মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী সধবা মহিলা। সিঁথিতে সিঁদুরের পুরু দাগ, ঠোঁট দুটি পানদোক্তার রসে রঞ্জিত, শাড়িতে গয়নায় স্বচ্ছল সংসারের গৃহিণী বলে তাঁকে সহজেই চেনা যায়।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হেড মিস্ট্রেস তাঁর সঙ্গে শীলার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর কথাই আপনাকে বলছিলাম মিসেস দত্ত। চমৎকার মেয়ে। ও স্কলারশিপ পাবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। অল্প কয়েক নম্বরের জন্যে পায় নি। যা কষ্ট করে পড়াশুনো করেছে শুনলে অবাক হবেন। ঘর-সংসারের কাজ ছাড়া ওর দুবেলা দুটি টিউশনি ছিল।'

বিমলপ্রভা বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'বল কি, স্কুলে পড়তে পড়তে তুমি টিউশনিও করতে নাকি?'

শীলা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'কোন্ কোন্ ক্লাসের ছাত্রীকে পড়াতে?'

শীলা বলেছিল, 'দুটি ছাত্রীকে পড়াতাম। একটি ফাইভের আর একটি নাইনের। শেষেরটি আমাদের ক্লাসেই পড়ত। তাকে ঠিক পড়াতাম না। একসঙ্গে পড়তাম। একা একা পড়তে তার মন বসত না।'

'তারপর সে টিউশনি দুটি কি হল?'

শীলা বলল, 'নাইনে যেটি পড়ত তার বিয়ে হয়ে গেছে আর ফাইভের ছাত্রীটির বাবা বাসা বদল করে এখান থেকে চলে গেছেন।'

'তাহলে এখন আর তুমি কোন টিউশনি কর না?'

শীলা বলল, 'না।'

বিমলপ্রভা আর কোন কথা বললেন না।

এর দিন তিনেক পরেই হেড মিস্ট্রেস শীলাকে আবার খবর দিয়ে পাঠালেন। অফিস রুমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, 'কিহে টুইশনটা আর করবে না কি?'

শীলা বলল, 'পেলে তো করি। কিন্তু কোথায় পাব।'

হেড মিস্ট্রেস মৃত্থ হেসে বললেন, 'একটা খোঁজ এসেছে। সেই যে মিসেস দত্তের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম তোমাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। তাঁর ছোট ছোট ছুটি মেয়েকে পড়াতে হবে। মাইনে কিন্তু কম। টাকা পনেরোর বেশি দেবে না।'

শীলা কি বলবে হঠাৎ যেন ভেবে পেল না। হেড মিস্ট্রেস মৌনতাকে দ্বিধার লক্ষণ মনে করে বললেন, 'অবশ্য আজই তোমাকে কথা দিতে হবে না। আমি মিসেস দত্তকে আরো দিনকয়েক বলেকয়ে রাখতে পারব। ভেবে দেখ, যদি টুইশন নেওয়া ঠিক কর তাহলে এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করলেই হবে।'

ভেবে দেখবার বেশি কিছু ছিল না। কারণ টাকার দরকার। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে খরচ বেড়ে গেছে। এক মাসে দাদার একটা জামা কি নিজেদের একখানা শাড়ি কিনতে হলে অন্য খরচপত্রে টানাটানি পড়ে যায়। জমাখরচের খাতা তো শীলাই রাখে। পনেরো টাকা যদি পাওয়া যায় তাই বা আসে কোত্থেকে। কলেজে যেতে নিজের ট্রাম-বাস ভাড়া, হাতখরচ ছাড়াও কয়েক টাকা বাঁচবে। শীলা স্থির করল মিসেস দত্তরা যদি তাকে পছন্দ করেন তাহলে টুইশনটা সে নিয়েই নেবে।

টুকরো কাগজে লেখা ঠিকানাটা নিয়ে কলেজ থেকে ফেরবার পথে বিকেল বেলায় শীলা গোবরা রোডের দোতলা বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কড়া নাড়বার দরকার হল না। তাকে দেখে ফ্রক-পরা আট-ন বছরের ছুটি মেয়ে ছুটে এল, 'শীলাদি, আপনাকে বুঝি হেড মিস্ট্রেস পাঠিয়েছেন?'

শীলা মেয়েটিকে চিনতে পারল। স্কুলের নীচের ক্লাসে ওদের সে এক বছর আগেও দেখেছে।

শীলা বলল, 'এই বুঝি তোমাদের বাড়ি? তোমাদের মা মিসেস দত্ত কোথায়?'

মেয়ে দুটি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দাঁড়ান, ডেকে আনছি।'

একটু বাদেই সেই মোটা ভদ্রমহিলাটি এসে দাঁড়ালেন, 'ওমা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, এসো ভেতরে এসো।'

শীলা তাঁর পিছনে পিছনে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাইরে থেকে যতখানি সংকোচ আর কুণ্ঠা অনুভব করেছিল শীলা ভিতরে এসে দেখল ততটা আর নেই। গোটা একটা বাড়ি নিয়ে থাকলেও ঘরদোর শীলাদের চেয়ে একটু বেশি সাজানো গুছানো হলেও তাদের মতই এরা মধ্যবিত্ত পরিবার। বসবার ঘরে সেই তক্তপোশ আর চেয়ার-টেবিল। এ বাড়িতে আরো অনেক চেনা বাড়ির মতই পরিচিত পরিবেশ পেয়ে শীলা খুব স্বস্তি বোধ করল।

বিমলপ্রভা বললেন, 'মিসেস গুপ্ত বোধ হয় তোমাকে সব বলেছেন। তোমার কথা তাঁর কাছে আমি অনেক শুনেছি। আমার ইচ্ছে তুমি আমার এই ছোট মেয়ে দুটিকে পড়াও।'

শীলা বলল, 'কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে কত ভালো টিউটর পেতে পারেন।'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'তা যে না পাওয়া যায় তা নয়। কিন্তু সব সময় ভালো টিউটর রাখলেই তো ফল ভালো পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোন জবরদস্ত কড়া মাস্টার আমি ওদের জন্যে চাইনে। আমি তোমার মতই একটি কমবয়সী ভালো মেয়ে খুঁজছিলাম। খেলা আর গল্পের মধ্যে দিয়ে পড়াশুনোটা যে ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে।'

শীলা ওঁর কথাবার্তা শুনে ভারি মুগ্ধ হল। এমন ভদ্র ব্যবহার সে

অন্য কোন বাড়িতে পায় নি। মাত্র দুদিনের আলাপে বিমলপ্রভাকে আত্মীয়ের মত মনে হল শীলার।

টুইশনের কথাবার্তা সেই দিনই পাকা হয়ে গেল। বাণী আর রাণীকে সেদিন থেকে পড়াতে আরম্ভ করল শীলা। ওদের দাদা সুকুমারের সঙ্গে আলাপ হতে অবশ্য আরো বহুদিন দেরি হয়েছিল।

চা খাওয়া শেষ করে কাপটি টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল শীলা। পাশের ঘরে তখনো তার বিয়ের প্রসঙ্গেই আলোচনা চলছে। স্যাকরা ডেকে আজ পর্যন্ত হার আর চুড়ি গড়াতে দেওয়া হয় নি বলে মা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দাদা বলছেন গয়না তিনি স্যাকরার কাছ থেকে গড়াবেন না, একদিন শীলা তার বউদিকে সঙ্গে করে নিয়ে সব জিনিস দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে আনবে। অফিসের প্রোপ্রাইটার হরকুমার মল্লিকের কাছে তিন মাসের মাইনে অগ্রিম চেয়ে রেখেছেন দাদা। সে টাকা এখনো হাতে আসে নি। টাকাগুলি পেলেই কেনাকাটা শুরু করবেন।

দুই দিদি রেণু আর রমার বিয়েতে যেমন টাকা খরচ করতে হয়েছে শীলার বিয়েতেও তেমনি দাদার বহু টাকা ব্যয় হয়ে যাবে একথা মনে হতে তার ভারি লজ্জা হয়। তাদের বিয়েটা সত্যিই যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমেরই হবে তাহলে সেই পুরনো ধরনের আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা হচ্ছে কেন। সেই গয়নাগাঁটি পণ-যৌতুক—ঘটকালি-করা বিয়েতে যা যা লাগে তার সবই লাগছে। অথচ সুকুমার আর শীলা দুজনেই জানে এ তাদের ভালোবাসার বিয়ে।

পণ-যৌতুকের ওপর সুকুমারের নিজের তেমন লোভ নেই। কিন্তু তার বাবা শশাঙ্ক দত্তের আছে। বিনা পণে বিনা যৌতুকে নিরলঙ্কার একটি মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনবেন, গাঁটের টাকা খরচ করে

আত্মীয়কুটুম্বকে খাওয়াবেন একথা তিনি ভাবতেই পারেন না। সুকুমার পারে, কিন্তু এ নিয়ে বাবাকে সে বেশি পীড়াপীড়ি করতে চায় না। তার আশঙ্কা বেশি চাপ দিতে গেলে বাবা আবার বেঁকে বসবেন। গোড়ার দিকে এ বিয়েতে তাঁর মত ছিল না। অনেক কষ্টে তাঁর সম্মতি আদায় করা গেছে। ফের যদি অমত করে বসেন তাহলে বিয়েটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বাপের অমতে বিয়ে যে সুকুমার না করতে পারে তা নয়, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তাঁকে আঘাত দিতে তার মন সরে না। অবশ্য শীলাও চায় না যে এই নিয়ে সুকুমারদের পরিবারে কোন অশান্তি আসুক। কিন্তু গরিব দাদার ওপর সব চাপ পড়বে এ কথা ভাবতেও তার কষ্ট হয়। গাঁয়ের বাড়িতে দিদির যখন বিয়ে হয়েছিল শীলার বাবা বেঁচেছিলেন। সব চিন্তাভাবনার ভার ছিল তাঁর ওপর। দাদার চেয়ে তাঁর রোজগারের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু আজ তার বিয়ের সব খরচ দাদাকে বহন করতে হচ্ছে এ কথা ভেবে শীলা ভারি কুণ্ঠা বোধ করে। শীলাকে তো তার দাদা মূর্খ করে রাখে নি, তাকে স্কুল-কলেজে পড়িয়েছে, যতখানি সাধ্য তার জন্যে খরচ করেছে তবু বোনের বিয়ের ব্যয় থেকে দাদার রেহাই নেই। সমস্ত আনন্দের মধ্যে এই ক্ষোভটুকু শীলার মনে কাঁটার মত বিঁধছে। তাদের স্কুলের বাংলার টিচার মণিকাদিও তো ভালোবেসে বিয়ে করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিভাবকদের কিছুই ব্যয় করতে হয় নি। রেজিস্ট্রেসনের খরচ পর্যন্ত মণিকাদি আর তাঁর স্বামী বিনয়দা ভাগাভাগি করে দিয়েছেন। শীলার মনে হয় তাদের বিয়েটাও ওই রকম হলে বেশ হত কিন্তু কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করার জন্যে বিনয়দা আর মণিকাদিকে নিজেদের পরিবার ছেড়ে এসে আলাদা বাসা বাঁধতে হয়েছে। বাপ মা ভাই বোন কারো সঙ্গেই তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। এমন বিয়েও অবশ্য শীলা চায় না। সে

চায় শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ ভরা একটি পুরো সংসার। সেই চাওয়ার মাশুল যদি তার দাদাকে জোগাতে হয় তো উপায় কি। একে সামাজিক নিয়ম বলেই তাকে মেনে নিতে হবে।

ভাবী শ্বশুর শশাঙ্ক দত্তের আকৃতি-প্রকৃতি শীলার যে গোড়াতে পছন্দ হয়েছিল তা নয়। বিমলপ্রভার স্বভাব যেমন শান্ত, কথাবার্তা স্নিগ্ধতায় ভরা, তাঁর স্বামী শশাঙ্কবাবুর প্রকৃতি তেমন নয়। টাক-পড়া বেঁটে চেহারার এই ভদ্রলোকের মেজাজটি যে রুক্ষ তা প্রথম দিনের পরিচয়েই শীলা টের পেয়েছিল।

সন্ধ্যা বেলাতে বাণী আর রাণীকে পড়াতে বসে একজনকে অঙ্ক কষতে দিয়ে আর একজনকে ইংরাজীর পড়াটা বুঝিয়ে দিচ্ছে—ভারি জুতোর শব্দে শীলা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। রাণী অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাবা এসেছেন।'

শীলা মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শশাঙ্কবাবু তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'ওদের পড়াবার জন্যে বুঝি তোমাকেই রাখা হয়েছে?'

শীলা একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পারবে তো?'

শীলা বলল, 'পারব।'

শশাঙ্কবাবু তার দিকে আর একটু কাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ, পারলেই ভালো।'

এরই মধ্যে বিমলপ্রভা পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে ঢুকলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'কখন এলে? চল হাতমুখ ধোবে চল।'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'যাই, তোমার নতুন টিউটরের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখছিলাম।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'আলাপ পরেও করে দেখতে পারবে। এখন ওরা পড়ছে পড়ুক। তুমি চলে এস।'

বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার কিছু কিছু কানে গিয়েছিল শীলার। শশাঙ্কবাবু বলছিলেন, 'মাস্টারনী রাখাই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল ওই পুঁচকে মেয়েটাকে রাখতে গেলে কেন। ও কী পড়াবে।'

বিমলপ্রভা জবাব দিয়েছিলেন, 'কদিন দেখই না কেন কেমন পড়ায়। আগে থেকেই অত অস্থির হবার কি হয়েছে। হেড মিষ্ট্রেসের কাছে ওদের অবস্থার কথা শুনে, মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ভারি ভালো লাগল। বেশ মিষ্টি চেহারা, দেখলে মায়া হয়।'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'তোমার মায়া কাকে দেখেই বা না হয়। অল্পবয়সী ছেলেই হোক মেয়েই হোক দেখলেই তো তোমার মায়া জাগে। আর সেই মায়া-মমতার মাশুল জোগাতে হয় আমাকে। তোমার যা রকম সকম তাতে খুব বড় লোকের ঘরের গিন্নী হওয়া উচিত ছিল।'

মিষ্টি হাসির শব্দ শোনা গিয়েছিল বিমলপ্রভার। তিনি বলেছিলেন 'দরকার নেই আমার বেশি বড়লোকের বউ হয়ে। এই বেশ আছি। আমার সুকুমার বাণী রাণী বেঁচে থাক। আমি বড়লোক কম কিসে।'

সুকুমার বাড়ির বড় ছেলে। শুধু বড় নয়, এখন একমাত্র ছেলে। আরো দুটি ভাই হয়েছিল সুকুমারের। তারা অল্প বয়সে মারা গেছে। বৈঠকখানা ঘরে যে পারিবারিক গ্রুপ ফটোখানা টাঙানো আছে তাতে ওই দু ভাইয়ের কোনো ফটো নেই। বাণী-রাণীর কাছেই তার দাদার গল্প প্রথমেই শুনেছিল শীলা। সুকুমার বি. এ. পাশ করে সরকারী অডিট ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়েছে। প্রথম বছর দুই কলকাতার

অফিসে ছিল। এখন বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মাস তিনেক হল আছে জলপাইগুড়ি-কুচবিহার এলাকায়।

সুকুমার বাড়িতে না থাকলেও তার কথা বাণী-রাণীর মুখে প্রায়ই শোনা যায়। দাদা বাড়ি না থাকাতে তাদের বড়ই অসুবিধে হয়েছে আগেকার মত তারা কোথাও বেড়াতে যেতে পারে না, সিনেমা সার্কাস দেখতে পারে না। দাদার কাছে যত আবদার চলে বাবার কাছে তার কিছুই চলবার জো নেই। কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেই বাবা অমনি ধমক দেবেন. 'খেতে খেতে গলা, হাঁটতে হাঁটতে নলা, মেয়েছেলের অত বেড়ানো কিসের রে?' কিন্তু দাদা বাড়ি থাকলে বাবার ধমকে বেশি ভয় পায় না বাণী-রাণী। সুকুমার লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নানা জায়গা দেখাতে নিয়ে যায়। বাবা অবশ্য তখনও ধমকান। কিন্তু সে ধমক সুকুমারের ওপর দিয়ে যায়। বাণী-রাণী তার আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা করে।

শশাঙ্কবাবু পোস্টমাস্টার হলে কি হয়, তাঁর মেজাজটি যে কড়া স্কুল মাস্টারের মত তা শীলা অল্প দিনেই টের পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ির অন্য লোকজনের মেজাজ তেমন নয়। এমনকি সুকুমারের প্রকৃতিও যে শান্ত, নম্র—তার মা আর বোনেদের মত কোমল স্নেহপ্রবণ – তা তাকে না দেখেই শীলা বুঝতে পেরেছে। বাণী-রাণী তাদের দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের প্রত্যেকের জন্মদিনে সুকুমার কিছু না কিছু কিনে দেয়। শুধু জামা-জুতোই নয়, খেলনা আর গল্পের বইও তাদের জন্যে আনে। আগে আগে শুধু খেলনা আসত। আজকাল তারা বড় হয়ে যাওয়ায় বইয়ের সংখ্যাই বেশি হয়। দাদার কাছ থেকে উপহার পাওয়া খেলনা আর বইগুলি দেখবার জন্যে একদিন শীলাকে ওপরে দোতলার বড় ঘরটিতে নিয়ে গেল তারা। বিমলপ্রভা রান্নাঘরের

কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শীলাকে দেখে বললেন, 'এসো এসো, কি ব্যাপার।'

শীলা লজ্জিত ভাবে বলল, 'এই দেখুন ওরা আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে এল; ওদের উপহারের জিনিসগুলি না দেখলে আজ নাকি ওরা কিছুতেই পড়বে না, একেবারে স্ট্রাইক করে বসে থাকবে।”

বিমলপ্রভা হেসে বললেন, 'ঠিকই তো, ছাত্রীদের সম্পত্তি তোমার না দেখলে চলবে কেন? সত্যি এই কদিনে কি বাধ্যই যে তুমি ওদের করে ফেলেছ। দিনরাত কেবল শীলাদি আর শীলাদি। তুমি কখন আসবে সেই আশায় ওরা পথ চেয়ে থাকে। মাস্টার মিস্ট্রেস এর আগেও তো ছিল। কিন্তু এমন ভক্ত ওরা আর কারো হয় নি।'

প্রশংসা শুনে স্মিত মুখ নামিয়ে চুপ করেছিল শীলা। অল্প দিনের মধ্যে এই পরিবারটিকে তারও খুব ভালো লেগে গেছে। বাণী-রাণীকে তার আর ছাত্রী বলে মনে হয় না। ওরা যেন তার ছোট দুই বোন।

শুধু উপহারের বইগুলিই নয়, কাঁচের আলমারি খুলে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা শৌখীন জিনিসপত্রও এক-একটি করে বিমলপ্রভা বের করে দেখালেন শীলাকে। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেবার। সেখান থেকে সমুদ্রের ফেনা আর ঝিনুক সংগ্রহ করে এনেছেন। সুন্দর ছোট সাদা শঙ্খটা সুকুমারের পছন্দ করে কেনা। মোষের শিঙের বড় বড় দুটি ধূপদানিও সুকুমারই কিনেছে। তা যাই বল, শখ আছে ছেলের। বিমলপ্রভার বহু ভাগ্য যে সুকুমার তার বাপের মত হয় নি। রূপ রুচি পছন্দ অপছন্দটা সে তার মায়েরই পেয়েছে। ওর বাবা জানেন শুধু মাছতরকারির বাজার করতে। সংসারে খাওয়া-পরা ছাড়াও যে আরো সাধ-আহ্লাদ আছে মানুষের তা তিনি বুঝতে চান না।

শীলা একটু হেসে বলেছিল, 'কেন মিছামিছি তাঁর নিন্দা মাসীমা, বয়সের সময় তাঁরও সব শখ-আহ্লাদ নিশ্চয়ই ছিল।'

মেয়েই হোক পুরুষই হোক, সহজে আত্মীয় সম্বোধনে অনা কাউকে ডাকতে পারে না শীলা। এমনকি দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্ব যাদের বাড়িতে তেমন আসা-যাওয়া নেই, যাদের সঙ্গে মেলামেশা কম, তাদেরও কাকা কাকীমা কি দাদা বউদি বলে ডাকতে কেমন বা বাধো লাগে শীলার। কিন্তু বিমলপ্রভার বেলায় তেমন সংকোচ হয় তিনি প্রথম থেকেই এমন আপনজনের মত ব্যবহার শুরু করেছেন তাঁকে মিসেস দত্ত বলে ডাকা ভালো শোনায় না।

মাসীমা সম্বোধনে বিমলপ্রভা খুব খুশি হলেন। শীলার ক জবাবে স্বামীর প্রসঙ্গে হেসে বললেন 'না বাপু, ওঁর চিরকালই একর গেল। সে বয়সেও যা ছিল এ বয়সেও তাই।'

স্বামীর চেয়ে ছেলের কথা বলতেই তাঁর আগ্রহ বেশি দেখা গেল। ছুটিছাটায় সুকুমারের বেড়াবার খুব শখ। আর শখ আছে ফটো তোলার। যেখানেই যাবে সেখানকারই নদী পাহাড় ঝোপঝাড়ের কি না কিছু ছবি ওর ক্যামেরায় ধরে নিয়ে আসবে। অনেক ছবি বন্ধুদে বিলিয়ে দিয়েছে সুকুমার, খানকয়েক কাগজেও ছাপা হয়েছে। বই আর বই সংগ্রহ করবার বাতিকও সুকুমারের কম নয়। শী চোখে পড়ল লম্বা লম্বা গোটা দুই র‍্যাক ইংরাজী বাঙলা নানা রক বইয়ে ঠাসা।

বিমলপ্রভা সেদিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'এই আমার ছেলের আর-এক বড় সম্পত্তি। আচ্ছা কে এসব সামলায় বল দেখি। বই ইঁদুরে কাটবে নাকি। আমি কি ঘর-সংসার দেখব না এই বইয়ের সংসার দেখব। আমি বলি নিজে যদি না রাখতে পার তোমার এই

প্রায় হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন বিমলপ্রভা। একখানা পিঁড়ি পেতে বসতে দিলেন শীলাকে। তারপর ছেলেমেয়েদের জন্যে লুচি বেলতে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাথরুম থেকে চানটান সেরে স্কুমার এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করছে। তার সংকোচ দেখে শীলাও কেমন একটু আড়ষ্টতা বোধ করল। বিমলপ্রভা তা লক্ষ্য করে ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কী, ঘরে আসছিস না যে।'

স্কুমার বলল, 'কোথায় আসব, বসব কোথায়।'

বিমলপ্রভা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কেন, ঘরে কি তুই আর জায়গা দেখতে পাচ্ছিসনে? আমরা কি ঘর জুড়ে বসেছি? আয় এখানে বোস এসে।'

ছেলের জন্যে আর-একখানা আসন পেতে দিলেন বিমলপ্রভা। স্কুমারের সঙ্গে বাণী-রাণীও এসে বসল।

মা আর ছেলের মধ্যে এই স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্ক ভারি ভালো লাগল শীলার। যেন এরা দুই সমবয়সী বন্ধু। দিদি-বউদির মতই বিমলপ্রভা ছেলের সঙ্গে বেশ হাসি-তামাসা করেন। শীলার মনে পড়ল নিজেদের বাড়িতে মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঠিক এ রকম নয়। মাকে তারা ভয় করে, সমীহ করে। এমন কাছাকাছি বসে তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করা শীলাদের পক্ষে প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার। দাদার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কও ওই রকম। শুধু শাসন আর নির্দেশ-উপদেশের সম্পর্ক। মা যে তাদের ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু সে ভালোবাসা বড় প্রচ্ছন্ন। মা ছেলেবেলা থেকেই ভারি কঠিন অভিভাবিকা। বিমলপ্রভার মধ্যে মায়ের আর-এক স্নেহশীলা মধুর মূর্তি দেখতে পেল শীলা। মাঝখানে

তিনি ছিলেন বলেই সুকুমার আর শীলার সম্পর্ক অত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পেরেছিল। নিজেদের সংকোচ আর আড়ষ্টতা অত সহজে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তারা।

মাকে কাছে পেয়ে সুকুমার ভারি ভরসা পেল। তার মুখে ফের কথা ফুটতে লাগল। মার দিকে তাকিয়ে শীলার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'জায়গা তো আছে, কিন্তু এ কি কাণ্ড করেছ মা!'

বিমলপ্রভা বললেন, 'কেন, কী আবার করলাম।'

সুকুমার বলল, 'রাণীদের টিউটরকে রান্নাঘরে ধরে নিয়ে এসেছ যে, ওঁকে দিয়ে রান্নাবান্নার কাজও করাতে চাও নাকি।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'কথা শোন ছেলের। তা যদি দু-একটা তরকারি রাঁধিয়েই নিই তাতেই বা দোষ কি? ও তো আমাদের মত গেরস্ত ঘরেরই মেয়ে। তুই কি ভাবিস তোর মত দিনরাত ও কেবল বইপত্তর নিয়েই থাকে? ওকে সংসারের সব কাজই করতে হয়।'

সুকুমার বলল, 'তা হোক। কিন্তু তুমি যদি মেয়েদের প্রাইভেট টিউটরকে দিয়ে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজও সারতে চাও তাহলে কোন টিউটরই আর শেষ পর্যন্ত তুমি পাবে না। যে আসবে সেই পালাবে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'আর যারা পালায় পালাক, কিন্তু শীলা পালিয়ে যেতে পারবে না। ওর বাড়িতে গিয়ে ফের আমি ওকে ধরে নিয়ে আসব।'

খাবার তৈরী করলেন বিমলপ্রভা, শীলা নিজেই চা তৈরীর ভার নিল। সুকুমারের কাপটি তার দিকে এগিলে দিল শীলা।

সুকুমার একটু চুমুক দিয়ে বিমলপ্রভার দিকে চেয়ে বলল, 'মা, চায়ে চিনি খুব কম হয়েছে।'

বিমলপ্রভা হেসে বললেন, 'তা আমাকে বলছিস কেন? চা যে করেছে তাকে বলবি। তুই একেবারে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে রইলি যে।'

এবার স্নকুমার প্রতিবাদ করে উঠল, 'কী বাজে কথা বলছ? আমি লজ্জা করতে যাব কেন? এর মধ্যে লজ্জার কী দেখলে তুমি।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'তা ঠিক, ও মোটেই লজ্জা পায় নি। শীলা, আমার ছেলেকে লাজুক বলে তুমি যদি ভেবে থাক তাহলে কিন্তু ভারি ভুল করবে।'

তাঁর কথা বলবার ভঙ্গিতে বাণী-রাণী হেসে উঠল। মুখ ফিরিয়ে হাসল শীলাও। তারপর চিনির কৌটোটা স্নকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কম হয়ে থাকে চিনি নিয়ে নিন চামচে করে।'

স্নকুমার বলল, 'কেন, আপনার নিজে দিতে আপত্তি কি।'

শীলা বলল, 'আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু দিতে গিয়ে আবার বেশি না হয়ে যায় তাই ভয়।'

বাণী বলল, 'বেশি হলে আবার খানিকটা লিকার ঢেলে দেবেন শীলাদি। এক কাপের জায়গায় দাদার দু কাপ চা খাওয়া হয়ে যাবে। দাদা তো আসলে তাই চায়।'

বিমলপ্রভা ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তোর ফন্দি-টন্দি বুঝতে বাণীর কিছু আর বাকি নেই। তুই আমাকে ঠকাতে পারিস কিন্তু বাণী রাণীকে কিছুতেই ঠকাতে পারবিনে।'

বাণী হেসে উঠল, 'শীলাদিকে ঠকানো যায় না মা। ভারি চালাক। সব পড়া রোজ বুঝে নিয়ে তবে ছাড়ে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'তবে তো মহা মুশকিল। একটু বোকা-টোকা হলে তোমাদের পক্ষে স্নবিধে হত।'

এমনি করে চায়ের আসরে টুকটাক কথাবার্তার মধ্যে আলাপ এগিয়ে চলল। সংকোচ দু পক্ষ থেকেই কমে এল। সুকুমার অফিস ফেরত প্রায়ই বোনেদের পড়ার ঘরে এসে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শীলার পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। সুকুমার বলে 'রসাল আর স্বর্ণলতিকার কবিতাটা বেশ তো বোঝাচ্ছিলেন, থামলেন কেন।'

শীলা কোন জবাব দেয় না। স্মিত মুখে চুপ করে থাকে।

টুইশন সেরে বাড়ি ফেরবার পথটুকু ভারি ভালো লাগে শীলার। পৃথিবীটা যেন আরো রঙীন আরো মধুর হয়ে উঠেছে। নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সেই মাধুর্যের স্বাদ পায় শীলা। আর-একজনের দুটি কথা, একটু হাসি, একটু চাওয়ার মধ্যে এত আনন্দ আছে ভেবে অবাক লাগে। সারাদিন টুইশনের এই দেড়টি ঘণ্টার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে শীলা। সন্ধ্যায় সুকুমারের সঙ্গে সামান্য যে কটি কথার বিনিময় হয়েছে রাত্রির অন্ধকারে তা মনে পড়তে থাকে। ভোরে উঠে প্রথমেই মনে হয় সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আবার দেখা হবে। সুকুমারের সঙ্গে আলাপের পর কলেজ যেন আরো রমণীয় হয়ে উঠেছে। সহ-পাঠিনীরা বলে, 'কিরে তোর অত ফুর্তি কিসের। আগে তো এমন ছিলিনে।'

শীলা জবাব দেয়, 'তোদের দেখবার ভুল, আমি যেমন ছিলাম ঠিক তেমনই আছি।'

কিন্তু নিজের মনে বেশ বুঝতে পারে কথাটা ঠিক নয়। সে সত্যিই বদলেছে, বদলে যাচ্ছে। কিন্তু ভিতরের এই পরিবর্তনটা বাইরের লোকের চোখে ধরা পড়ুক তা চায় না শীলা। গোপন কথাকে গোপন রাখতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। বাড়ির কাউকেও কিছু বলে না।

কিন্তু একদিন আর গোপন রইল না। হঠাৎ সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে বসল শীলার। কলেজ থেকে ছুটি নিল। বাণীদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিল সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কদিন আর সে পড়াতে যেতে পারবে না। দুদিন বাদে বাণীর সঙ্গে তার দাদা সুকুমার এসে উপস্থিত। শীলার অসুখের খবর শুনে মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এই খবরই সে বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে কারোরই বুঝতে বাকি রইল না যে সে শুধু বার্তাবহই নয় ভিতরে ভিতরে আরো কিছু বহন করে। শীলা দাদা, বউদি, মা বাড়ির সকলের সঙ্গে সুকুমারের আলাপ করিয়ে দিল। প্রথমদিনের আলাপে সুকুমার ভারি আড়ষ্ট। নিজে থেকে সে কোন কথা বলে না। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে জবাব দেয়। খানিক বাদে বউদির দেওয়া চা আর খাবার খেয়ে সুকুমার বিদায় নিল।

অমনি জ্যোৎস্না শীলাকে নিয়ে পড়ল। বিছানার পাশে এসে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এতদিন ছাত্রীদের কথাই শুনেছি। তাদের যে একজন এমন সুন্দরপানা দাদা আছে, কই সে কথা তো একদিনও বল নি।'

শীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ, সব কথাই বলতে হবে নাকি?'

জ্যোৎস্না বলল, 'তা তো ঠিকই। আজকাল কি আর সব কথা বলতে হয়? বরং সব লুকোতে পারলেই সুবিধে।'

শীলা বিরক্তির ভান করে বলল, 'কী যা তা বকছ, আমার ভালো লাগে না। সত্যি বলছি বউদি, আমার ভারি মাথা ধরেছে।'

জ্যোৎস্না হেসে বলল, 'মাথা নয়, ধরেছে অন্য জায়গায়। অনর্থক মাথার কেন দোষ দিচ্ছ।'

জোরে দুটি গাল টিপে দিয়ে জ্যোৎস্না রান্নাঘরের কাজে চলে গেল।

তা ঠিক। তখন থেকে শীলা অনেক কথাই লুকোতে শুরু করেছিল। বাণী-রাণীদের পড়ানো শেষ করে সে যখন বেরিয়ে আসত তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে সুকুমারও যে তার সঙ্গ নিত, সোজা পথে না এগিয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তা পার হয়ে দক্ষিণমুখে হাঁটতে আরম্ভ করত একথা শীলা কাউকে বলে নি। প্রথম প্রথম কোন কথাই তাদের মধ্যে হত না। কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ যেন সেই নির্জন পথে কথা বলতে বলতে চলত। অবশ্য পথ যে সত্যিই নির্জন থাকত তা নয়। মোড়ের পান-বিড়ির দোকানটায় কয়েকজন লোক থাকত, তারা শীলাদের লক্ষ্য করত, নতুন ডিসপেনসারির ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার আর রোগীর দল ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকাত, পথেও নানা-বয়সী লোকজনের মুখোমুখি হতে হত তাদের। কিন্তু শীলাদের কাছে তাদের যেন সত্যিকারের অস্তিত্ব ছিল না। তারা যেন ঠিক মানুষ নয়, মানুষের ছায়া।

তারপর একদিন গোবরা রোড দিয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের রেলিঙের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে সুকুমার হঠাৎ বলে বসল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

প্রস্তাবনার ভঙ্গি শুনে শীলার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'বলুন।'

সুকুমার একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বই নিতে আসে। ভেবেছি ওদের জন্যে একটা লাইব্রেরি করলে কেমন হয়।'

শীলা বলল, 'ও, এই কথা।'

সুকুমার ওর দিকে তাকাল, 'কেন, আপনি কি অন্য কথা ভেবেছিলেন?'

শীলা মৃদু হেসে বলল, 'না আমি কিছু ভাবি নি। আমি আবার কী ভাবব।'

দুজনে দুজনের দিকে ফের একবার তাকাল। মনের কথা কেউ মুখ ফুটে বলল না। তবু একজনের কথা আর-একজনের বুঝতে একটুও বাকি রইল না।

শীলা বলল, 'বেশ তো, লাইব্রেরি করবেন সে তো খুব ভালো কথা।'

সুকুমার বলল, 'ভালো কথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। এ কাজে আপনাকেও থাকতে হবে। আমরা দুজনে মিলে জিনিসটা গড়ে তুলব।'

শীলা বুঝতে পারল এবার আসল কথাটা সুকুমার কোন রকমে বলে ফেলতে পেরেছে। তারা দুজনে মিলতে চায় এইটুকুই তার আসল বক্তব্য। বাকি কথাটুকু বাড়তি।

শীলা বলল, 'আমার যতটুকু সাধ্য আমি করব।'

সুকুমার বললে, 'তাহলেই যথেষ্ট। আপনার সাধ্য অনেকখানি।'

লাইব্রেরি গড়ে তোলবার কাজটা যখন সত্যি সত্যি আরম্ভ হল তখন আর তাকে বাড়তি বলে কারো মনে হল না। কাজটাই আসল। কাজের মধ্যে এই যে তারা মিলতে পারছে, এই মিলই সত্যিকারের মিল বলে তাদের ধারণা হল।

বাইরের সেই বসবার ঘরখানাতেই ছোট ছোট দুটো আলমারি সাজিয়ে কিশোরদের এক লাইব্রেরি খুলল সুকুমার। পুরনো বই কিছু ছিল। আরো নতুন পুরনো কিছু বই সুকুমার সংগ্রহ করে আনল।

সুকুমারের বাবা শশধরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'এ সব কি কাণ্ড। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বাড়ির মধ্যে এ কি হট্টগোল আরম্ভ করল বল তো?'

কিন্তু বিমলপ্রভা ছেলের দলে। তিনি বললেন, 'হট্টগোল কোথায় শুনি? এই উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক জায়গায় জড় হবে, দুখানা বই পড়বে, দুটো কথা আলোচনা করবে তা তোমার সইবে কেন। তোমার ক্ষতিটা কি আমি তো কিছু বুঝিনে। তুমি তো আর বিকেল বেলায় বাড়ি থাক না, ছুটির দিনেও পাড়ায় তাসপাশার আড্ডায় তোমার সময় কাটে। তার চেয়ে ছেলেদের এ-ধরনের আড্ডা অনেক ভালো। মেয়ে দুটো অলিগলি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাড়িতে একটা ক্লাব-টাবের মত হলে হলে ওরা ঘরে থাকবে।'

তাঁর সমর্থন পেয়ে সুকুমার আর শীলার উৎসাহ বেড়ে গেল।

সুকুমার বলল, 'আমাদের এই পারিবারিক পাঠচক্রের সেক্রেটারি হবে মা।' শীলার দিকে চেয়ে বলল, আর 'আপনাকে হতে হবে লাইব্রেরিয়ান।'

শীলা মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিছু হতে পারব না, যা করতে বলবেন করব।'

সুকুমার বলল, 'হতে বলাটা বুঝি কিছু করতে বলা নয়।'

তারপর দু বছর ধরে লাইব্রেরি আর ক্লাব চালানোর ভিতর দিয়ে তারা অনেক কাছাকাছি এল। গোড়ার দিকের সেই সংকোচ আর রইল না। আড়ালে আবডালে সুকুমার তাকে তুমি বলতে শুরু করল এবং শীলাকেও তুমি বলিয়ে ছাড়ল।

ছেলের একটা বিয়ের সম্বন্ধের আলোচনায় শশধরবাবু যখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন, সুকুমার বাধা দিল। পরিষ্কার বলল, বিয়ে সে করবে না। মার কাছে আরও স্পষ্ট করে বলল, সে শীলাকে বিয়ে করবে। কথাটা কি করে বিমলপ্রভার কাছে সুকুমার বলতে পারল শীলা এখনও ভেবে অবাক হয়। কিন্তু তিনি যে অত উদার, তবু তাঁর

মুখখানা প্রথমে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখি, ওঁকে বলে দেখি।'

এ কথা শোনার পর শশধরবাবু প্রথমটায় খুব চেঁচামেচি হৈ চৈ করেছিলেন। সংসারে যার যা খুশি সে তাই করুক, তাঁর যেদিকে চোখ যায় তিনি চলে যাবেন। কিন্তু বিমলপ্রভা বুঝিয়ে শুনিয়ে স্বামীকে শান্ত করেছেন। অন্য জাতের মেয়েকে তো আর বিয়ে করছে না সুকুমার। শীলা কায়েতেরই মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী, দুদিন বাদে বি. এ. পাশ করবে। বিশেষ করে ছেলে যখন পছন্দ করেছে তখন আর বাধা দেওয়া উচিত নয়। পণ যৌতুক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তাঁদের কোন দাবি নেই। কিন্তু লোকে যাতে নিন্দা না করে সে বিবেচনার ভার শীলার দাদা অজিতের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

খেয়ে দেয়ে দশটার সময় অফিসে বেরোবার আগে স্ত্রীর হাত থেকে পান নিয়ে চিবুতে চিবুতে মিনিট কয়েক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা অজিতের অনেক দিনের অভ্যাস। কিন্তু কদিন ধরে এই নিভৃত দাম্পত্যালাপের মধ্যেও শীলার বিয়ের প্রসঙ্গ এসে ঢুকেছে। দু-চার কথার পরেই ওর বিয়ের কথা ওঠে। অজিত নয়, জ্যোৎস্নাই আগে তোলে প্রসঙ্গটা। দু-চার কথার পরেই বলে, 'ভালো কথা, ভুলে গিয়েছিলাম—'

অজিত হাসে, 'ভালো কথা মানে শীলার বিয়ের কথা তো? ও কথা যে তুমি ভুলতে পারো তা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। উৎসাহ উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে বিয়েটা যেন শীলার নয় তোমার নিজেরই।'

জ্যোৎস্না লজ্জিত হয়ে বলে 'আহাহা।'

অজিত লক্ষ্য করেছে শুধু নিজের বাড়ির বিয়ে বলে নয়, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শী যে কারো বাড়িতে যে কোন বিয়ের উপলক্ষ ঘটলেই জ্যোৎস্না উল্লসিত হয়ে ওঠে। ওর কথায় বার্তায় চালচলনে যেন নতুন করে প্রাণে চাঞ্চল্য জাগে। বিয়েটা একান্ত করে যে মেয়েদেরই নিজস্ব ব্যাপার তাতে অজিতের কোন সন্দেহ নেই।

অন্য দিনের মত আজও দুজনের মধ্যে সেই আলোচনাই হচ্ছিল। কিন্তু আলাপের ধরনটা গোড়া থেকেই যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল। স্বামীর হাতে পানটা তুলে দিয়ে জ্যোৎস্না বলল, 'সত্যি, মা যে বলেন, মিথ্যে কথা বলেন না। এই তো কদিন বাদে বিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুরই জোগাড় নেই। তুমি যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ, কোথায় টাকা কোথায় পয়সা—'

অজিত বলল, 'বসে থাকব না কি কেবল ছটফট ছুটোছুটি করে করে বেড়াব ? তাতে কি কিছু লাভ হবে ?'

জ্যোৎস্না বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছুটোছুটি করতে তোমাকে কেউ বলে না, কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যবস্থাটা তো করতে হবে এর পর টাকা এনে কখনই বা জিনিসপত্তর কিনবে।'

অজিত উত্ত্যক্ত হয়ে বলল, 'সে হিসেব আমার আছে। কলকাতায় এক ঘণ্টার মধ্যে একটা কেন অমন সাতটা বিয়ের বাজার করে ফেলা যায়। আসল কথা হল টাকা। তা যতক্ষণ না হাতে আসছে ততক্ষণ ছটফট করেও লাভ নেই, তোমার মত বকবক করেও লাভ নেই।'

জ্যোৎস্না বলল, 'লাভ নেই তা জানি। কিন্তু লাভ নেই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই তো আর ঘরে টাকা আসবে না। লোকের কাছে যেতেও হবে, মুখ ফুটে চাইতেও হবে।'

অজিত এবার অসহিষ্ণু ভাবে ধমক দিয়ে উঠল স্ত্রীকে, 'কী হবে না হবে আমার তা জানা আছে। তুমি আর বকবক কোরো না। কাজ-কর্ম যদি থাকে তাই করো গিয়ে। আর তা যদি না থাকে তো যাও চুপচাপ কোথাও গিয়ে বসে-টসে থাক।'

জ্যোৎস্না বলল, 'হ্যা আমি তো সারাদিন বসেই থাকি আর আমার যত কাজকর্ম সব তুমি এসে করে দাও। স্ত্রীপুত্রকে সংসারে আর তো কেউ খেতে পরতে দেয় না, ছোট বোনকে আর তো কেউ বিয়ে দিতে চায় না। এ সব জিনিস তুমিই নতুন করছ।'

অজিত চীৎকার করে বলল, 'চুপ।'

নিরুপমা পাশের ঘরে ছিলেন। ছেলে আর ছেলের বউয়ের ঝগড়া শুনে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আবার তোদের কি হল অজিত ? অফিসে বেরোবার সময়ও একটু শান্ত সুস্থ মত যেতে

পারিসনে! আর তোমাকেও বলি জ্যোৎস্না, তোমাদের যত ঝগড়া বিবাদ কি ওর এই বেরোবার সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে? বাদবিসংবাদের কি আর কোন সময় নেই?'

জ্যোৎস্না বলল, 'সময় থাকবে না কেন মা, আছে। কিন্তু দিনরাত আপনারাই তো ঘ্যানঘ্যান করছেন টাকার জোগাড় করল না, টাকার জোগাড় করল না। করল না, তো সে কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি। যাকে বলবার তাকে এসে বলুন। তা তো কেউ বলবেন না, সে বেলায় আপনারা সবাই ভালো মানুষ। যদি আর কেউ বলতে গেল তা হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় আপনাদের।'

অজিত রূঢ় স্বরে বলল, 'দেখ মা, কথার ছাঁদ দেখ একবার।'

নিরুপমা বললেন, 'দেখা আমার অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে বাপু। দেখাশোনার আমার আর কিছু বাকি নেই। এবার অফিসে যেতে হয় তো যাও, কাজকর্ম সেরে এসো গিয়ে।'

অজিত আর কোন কথা না বলে স্ত্রীর দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কেবল টাকা আর টাকা, টাকা আর টাকা। টাকার চেষ্টা যেন সে আর করছে না। সে যেন সত্যিই নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। বসে যে নেই তা তার বন্ধুবান্ধব সবাই জানে, বসে যে নেই তা জানে বসাক অ্যাণ্ড সন্সের মালিক মুরারিমোহন।

তিল আর নারকেলের সুগন্ধি তেল তৈরী করে বসাকরা। তিন বছর ধরে অজিত সরকার বসাকদের এই ফার্মে কাজ করে আসছে। পদটা ম্যানেজারের, কিন্তু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কাজ করতে হয় সব রকমই। চিঠিপত্র লেখা, বিজ্ঞাপনের কপি তৈরী, ফার্মের প্রতিনিধি হিসেবে বড় বড় পার্টির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, মামলা-মোকর্দমার

তদ্বির, ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন, সব ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে হয় অজিতকে। মাসের পর মাস তার পোর্টফলিও বেড়েই চলেছে। কিন্তু মাসান্তে সেই যে দুশোটি মুদ্রা তিন বছর আগে বরাদ্দ হয়ে রয়েছে অজিতের, তার থেকে মুরারিবাবু আর একটি পয়সাও বাড়ান নি। প্রথম প্রথম আকারে ইঙ্গিতে, তারপর স্পষ্টই মাইনে বাড়াবার জন্যে অজিত অনুরোধ করেছে মুরারিবাবুকে কিন্তু তিনি প্রতিবার কেবল প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, টাকার অঙ্ক একবারও বাড়িয়ে দেন নি। কোনবার হেসে বলেছেন, 'দেখছেন তো কারবারের অবস্থা। কি করে বাড়াই বলুন। আপনার মা-বাবার আশীর্বাদে যেটুকু আছে সেটুকু এখন বজায় রাখতে পারলে হয়।' কোনবার বা মাইনে বাড়ার আবেদনের উত্তরে একশিশি কোকিল-মার্কা তিল-তৈল মুরারিবাবু অজিতের হাতে তুলে দিয়ে মৃদু হেসে বলছেন, 'বউমাকে দেবেন। এবারকার সেণ্টটা ভারি চমৎকার হয়েছে। মাইনে বাড়াতে হবে বৈকি অজিতবাবু, না বাড়ালে চলবে কেন আপনার। কিন্তু এদিকটাও যে কিভাবে চলেছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। যা কম্পিটিশনের বাজার, কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিনে। এরপর যদি cost of production চট করে বাড়িয়ে ফেলি একেবারেই যে অকূল পাথারে পড়ে যাব।'

মুরারিবাবুর ভাব-ভঙ্গির কথা শুনে জ্যোৎস্না স্বামীকে একদিন বলেছে, 'ওখানে তোমার আর সুবিধে হবে না। তিন বছর কেন, তিরিশ বছর কাজ করলেও বসাক কোম্পানি তোমার মাইনে বাড়াবে না। তুমি অন্য অফিসে চেষ্টা-চরিত্র কর।'

শীলাও মাঝে মাঝে বকেছে, 'সত্যি দাদা, ওখানে পড়ে থাকবার আর কোন মানে হয় না।'

মানে যে হয় না তা কি অজিত নিজেই বোঝে না? কিন্তু বুঝেও কোন সুবিধা করে উঠতে পারে কই। মাঝে মাঝে ভালো চাকরি সংগ্রহের জন্যে উঠেপড়ে লাগে। দু-একজন বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করে, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সরকারী বেসরকারী অফিসগুলিতে দু চারখানা অ্যাপলিকেশন ছাড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফলই হয় না, তাই আবার বসাকদের কাজে নতুন করে মন লাগায় অজিত। বিজ্ঞাপনের কপির মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির স্বাদ পেতে চেষ্টা করে।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটে গেল অজিতের। আর শীলার বিয়েই হল এই পরিবর্তনের উপলক্ষ।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বেরোবার পর মেজাটটা শুরু থেকেই খারাপ ছিল অজিতের। অফিসে এসে দেখল অ্যাসিস্টাণ্ট বিনয় সেন আজও কামাই করেছে। টেবিলের দেরাজ বোঝাই জরুরী সব চিঠিপত্র। কতক জবাব আজ না দিলেই নয়। অপ্রসন্ন মনে কড়া ইংরেজীতে খানকয়েক চিঠির খসড়া করল অজিত। তারপর সেগুলিকে টাইপ করল একখানা একখানা করে। কয়েকখানা চিঠিতে মালিকের স্বাক্ষর দরকার। বেল টিপে বেয়ারা শ্যামাপদকে ডাকল অজিত। সে এসে সামনে দাঁড়াতে কিন্তু মত বদলে ফেলল। স্থির করল নিজেই যাবে মুরারিবাবুর ঘরে। চিঠিগুলিতে সই করাবার ফাঁকে আবার টাকার কথাটা বলবে। বোনের বিয়ের জন্যে হাজার খানেক টাকা অ্যাডভান্স চেয়েছে অজিত। মাইনে থেকে মাসে মাসে পঁচিশ-ত্রিশ করে কাটিয়ে দেবে। মুরারিবাবু নিমরাজী হয়েছেন। অফিসের অল্প মাইনের কর্মচারীদের এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা তিনি দিয়ে থাকেন। মাইনে

কম দিলেও কর্মচারীদের মেয়ে কি বোনের বিয়ে কিংবা বাপ-মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিবেচনা করেন মুরারিবাবু। অজিতের বেলাতেও সে বিবেচনাটা না হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্যামাপদকে মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনবার জন্যে পাঠিয়ে চিঠির ফাইল বগলে নিয়ে অজিত নিজেই হাজির হল মুরারিবাবুর ঘরে।

ম্যানেজারের জন্যে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা থাকলেও মুরারিবাবুর নিজের ঘরখানা দেশী কায়দায় সাজানো। ঘরজোড়া তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা। তার ওপর সারি সারি গুটি তিনেক ক্যাশবাক্স। এক পাশে বাঁধানো পঞ্জিকা আর খেরো-বাঁধানো হিসাবের খাতা স্তূপীকৃত।

মুরারিবাবু ঘরে একা ছিলেন না। তাঁর তরুণ শ্যালক সুবল তালুকদার ফিসফিস করে কী যেন আলাপ করছিল। অজিত ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দুজনে একটু সরে নড়েচড়ে বসলেন।

মুরারিবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার। সই করতে হবে বুঝি? দিন, আপনার নিজের এত কষ্ট করবার কি দরকার ছিল? শ্যামকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন।'

অজিত একটু হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথাও আছে।'

মুরারিবাবুর মুখখানা একটু যেন গম্ভীর দেখাল। চিঠিগুলিতে সই করতে করতে বললেন, 'ও!'

সুবল বলল, 'আচ্ছা আপনি তাহলে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, আমি এবার চলি জামাইবাবু।'

মুরারিবাবু সস্নেহে বললেন, 'আরে বোসো বোসো। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।'

সুবল বলল, 'না জামাইবাবু, এখন আর বসব না। কাজ আছে একটু। আপনি অজিতবাবুর সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন। আমি ঘুরে আসছি।'

সুবল বেরিয়ে গেলে মুরারিবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

ব্যাপারটা যে মুরারিবাবু বুঝতে পারেন নি তা অজিতের মনে হল না। বোনের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, তার জন্যে টাকার দরকার এ কথা এর আগেও কয়েকবার অজিত মুরারিবাবুকে বলেছে। তিনি ভরসা দিয়েছেন, বেশ তো, দরকারমত নেবেন। একটু ইতস্তত করে অজিত আর-একবার কথাটা মনে করিয়ে দিল, 'টাকাটা আমার আজই দরকার মুরারিবাবু।'

মুরারিবাবু বিস্মিত ভঙ্গিতে বললেন, 'টাকা, কিসের টাকা?'

অজিত বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি। আমার বোনের বিয়ের আর সপ্তাহখানেকও নেই। জিনিসপত্র কেনাকাটা সবই বাকি। টাকাটা আজই আমাকে দিয়ে দিতে বলুন।'

মুরারিবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'হুঁ, তা কত টাকা দরকার আপনার?'

অজিত বলল, 'অন্তত হাজার খানেক।'

মুরারিবাবু কপালে চোখ তুললেন, 'বলেন কি! হাজার টাকা! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি অজিতবাবু? অত টাকা কোথায় পাব আমি?'

মুরারিবাবুর কথা বলবার ধরন দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল অজিত। তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'কোথায় পাবেন সে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। টাকাটা আমার দরকার। আপনি দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।'

মুরারিবাবু বললেন, 'না, হাজার টাকা আমি দেব এমন কথা আপনাকে আমি দেই নি। অত টাকা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভবও নয়!'

অজিত একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'সম্ভব কি অসম্ভব সে বিচার আমার করা উচিত হবে না। যাঁর এত টাকা ব্যবসায়ে খাটছে তাঁর পক্ষে এক হাজার টাকা একজন কর্মচারীকে আগাম দেওয়াটা সাধ্যাতীত ব্যাপার কিনা সে কথা আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন। আমি শুধু বলতে চাই আপনি কথা দিয়েছিলেন, আর সেই কথার ওপর নির্ভর করে আমি সব আয়োজন করে ফেলেছি। এখন আপনি আর কথার খেলাপ করতে পারেন না।'

মুরারিবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'কথার খেলাপ! এত বড় স্পর্ধা, এত বুকের পাটা আপনার যে আমার গদিতে বসে আমার মাইনে-করা কর্মচারী হয়ে আমার মুখের ওপর আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন? যান চলে যান এখান থেকে। নিজের কাজকর্ম করুন গিয়ে, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এক হাজার টাকা তো ভালো একটি পয়সাও আপনাকে আমি দিতে পারব না। এই আমার শেষ কথা।'

কিন্তু অজিতেরও ততক্ষণে রোখ চেপে গেছে। সে মুরারিবাবুকে অত সহজে কথা শেষ করতে দিল না। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি শেষ করলেও আমার অনেক কথা বাকি আছে। আপনাকে সব শুনতে হবে।'

মুরারিবাবু শ্লেষের ভঙ্গিতে বললেন, 'শুনতেই হবে! আচ্ছা কি আপনার বলবার আছে বলুন।'

অজিত বলল, 'টাকাটা আমাকে আপনি ভিক্ষেও দিচ্ছেন না, দানও করছেন না। আমার মাইনের againstএ এই টাকাটা আমি চাইছি। মাসে মাসে যত টাকা ইচ্ছে আপনি কাটিয়ে নেবেন।'

মুরারিবাবু এবার শান্তভাবে একটু হেসে বললেন, 'কিসের মাইনে? আপনি কি মনে করেন এর পরেও আপনাকে আমি আমার অফিসে কর্মচারী হিসেবে রাখতে পারব? আমার সাধ্য নেই অজিতবাবু, আমার সাধ্য নেই; আপনাকে যদি রাখতে হয় আমার জায়গা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

মুরারিবাবুর কথার ধরনে বুকের ভিতরটা এবার কেঁপে উঠল অজিতের, এতক্ষণ কথার পিঠে কথা চালিয়ে গেছে, উচিত কথাই বলেছে অবশ্য। খেয়াল হয় নি যে মনিবের কাছে উচিত কথা বলবার ধরনটা আলাদা। মুরারিবাবু সত্যিই কি এত বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে চরম কিছু করে ফেলতেও তার বাধবে না! আশঙ্কায় বুকটা দুর দুর করে উঠল অজিতের। একটু চুপ করে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন মুরারিবাবু। আপনার জায়গা—'

মুরারিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমার জায়গাটা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারলেই সুবিধে হত। কিন্তু তা তো সম্ভব হবে না। আমার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনরা তাতে আপত্তি করবে। তাই দয়া করে আপনাকেই ছেড়ে যেতে হবে। সুবল একটু বাদেই আসবে। তাকে চার্জটা বুঝিয়ে দেবেন। বি. এ. টা তো সুবলও পাশ করেছে। ওকে চার্জ বোঝাতে খুব বেশি বেগ বোধ হয় আপনাকে পেতে হবে না। ক্যাশিয়ারকে আমি বলে রাখব। এ মাসের মাইনে ছাড়া নোটিশ পিরিয়ডের এক মাসের মাইনেটাও আপনি তার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মুরারিবাবু, 'আপনি গুণী লোক। এখানে চাকরি করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। সত্যিই তো। আপনার যোগ্য মর্যাদা আপনাকে তো আজো দিতে পারি নি। হ্যাঁ,

আর দুশো টাকা আপনার বোনের বিয়ের জন্যে আপনি নিয়ে যাবেন। ও টাকা আপনাকে আর ফেরত দিতে হবে না। মুরারি বসাক কাউকে কথা দিলে খেলাপ করে না, এটা ঠিকই জানবেন।'

মুরারিবাবু সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দোরের কাছে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। মুরারিবাবু কোনদিকে না তাকিয়ে তাতে উঠে পড়লেন। জরুরী দরকারে একবার অ্যাটর্নির কাছে যেতে হবে তাঁকে। অজিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা সত্য না স্বপ্ন তা যেন এখনো সে বুঝে উঠতে পারছে না। তার তিন বছরের চাকরি এমন তিন মিনিটের মধ্যে চলে যাওয়াটা কি সত্যিই সম্ভব?

মুরারিবাবু বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কর্মচারীরা এসে তাকে ঘিরে ধরল। 'কী হল অজিতবাবু, কী হল।'

অজিত বিরস তিক্ত স্বরে বলল, 'যা হল তা তো সবাই শুনেছেন।' বুড়ো ক্যাশিয়ার অনঙ্গ পোদ্দার বললেন, 'আপনি বড় ভুল করেছেন অজিতবাবু, মনিবকে অমন চড়া চড়া কথা শোনানো আপনার উচিত হয় নি।'

প্যাকিং ডিপার্টমেন্টের তারাপদ বলল, 'চড়া নরমে কি হবে ক্যাশিয়ারবাবু। শালা মহারাজ যেদিন থেকে ঘুরঘুর করছেন সেদিনই আমরা বুঝেছি অজিতবাবু এখানে আর বেশিদিন নেই। উনি এতদিন কেবল অজুহাত খুঁজছিলেন।'

সব ডিপার্টমেন্টেই সারাদিন ধরে ফিসফিস কানাকানি চলল। অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করল অজিতের জন্যে। লোকটি বড়ই ভালো ছিল। যেমন শান্ত, তেমনই সৎ। কারো সঙ্গে তার কোনদিন ঝগড়া রাগারাগি হয় নি। দারোয়ান বেয়ারা কুলী মজুরের সঙ্গে পর্যন্ত

হেসে কথা বলেছে। সেই মানুষের এমন মাথা গরম হল কেন কে জানে।

অনঙ্গবাবু পরামর্শ দিলেন মুরারিবাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে। একটু অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতি করতে। যদিও ফল হবার আশা কম, তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

কিন্তু অজিত মাথা নেড়ে স্পষ্টই জানিয়ে দিল তা সে পারবে না। ক্ষমা চাওয়ার মত কোন কাজ সে করে নি, ক্ষমা সে চাইবেও না।

পুরোনো কর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যদিনের মত সন্ধ্যার একটু আগে অজিত বাসার পথ ধরল।

প্রথমে অজিত ভেবেছিল আজ আর অত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে না, এমন কিছু তাড়া নেই ফেরার। এমন কি সুসংবাদ সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে ছুটে গিয়ে বাড়ির সবাইকে না জানালে চলবে না? কিন্তু বৌবাজার স্ট্রীট থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত হেঁটে এসে ঠিক অন্যদিনের মতই পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠে পড়ল অজিত। রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল না, কোন পার্কের কোণে গিয়ে বসল না, কোন বন্ধুবান্ধবের বাসায় গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে আসার কল্পনাও আজ আর মনঃপূত হল না তার। অভ্যস্ত যন্ত্রের মত অজিত ঠিক অন্যদিনের মতই বাসায় এসে পৌঁছল। অন্যদিনের মত আজ আর হাঁকডাক শুরু করে দিল না, ছেলেমেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করল না, তক্তপোশের উপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

সকলের আগে অজিতের মা নিরুপমা ঘরে ঢুকলেন। ছেলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি হয়েছে রে অজিত, অমন করে শুয়ে পড়লি কেন? জ্বর-টর এল নাকি?'

অজিতের ইচ্ছা ছিল না এমন করে আর কারো চোখে ধরা পড়ে

যায়। তার যে কোন ভাবান্তর ঘটেছে, সে যে দুর্বল বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে কথা কেউ টের পেয়ে যাক তা সে মোটেই চায় না। মায়ের কথার জবাবে তাই অজিত বিরক্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না, জ্বর-টর হয় নি। তুমি যাও, তোমার কাজকর্ম কর গিয়ে।'

কিন্তু নিরুপমা সরে গেলেন না। ছেলের আরো কাছে এগিয়ে এসে কপালে হাত রেখে দেখলেন সত্যিই জ্বর-টর কিছু হয়েছে কিনা। অজিতকে সুস্থ দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বল তো। টাকা দেয় নি ওরা, না?'

অজিত আরো বিরক্ত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'না না। দেয় নি, দেবেও না। হল তো এবার? যাও, আর বিরক্ত কোরো না আমাকে।'

কিন্তু ছেলের কথার ভঙ্গিতে নিরুপমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল। তিনি অজিতের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সত্যি করে বল দেখি হয়েছে কি। মুরারিবাবুর সঙ্গে চটাচটি করে এসেছিস নাকি? তিনি কি কিছু তোকে বলেছেন?'

অজিত বলল, 'হ্যাঁ একেবারে চরম কথা বলে দিয়েছেন। ওখানে আমাকে আর চাকরি করতে হবে না।'

নিরুপমা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে শুধু বলতে পারলেন, 'বলিস কি? অ্যাঁ?'

এত তাড়াতাড়ি দুঃসংবাদটা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না অজিতের। ভেবেছিল দু-একদিন বাদে ধীরে সুস্থে কথাটা বাড়ির সবাইকে জানাবে। এমনভাবে বলবে যেন কিছুই হয় নি, হেন চাকরিকে পরোয়া করে না অজিত। যা ঘটেছে তার জন্যে তার কোনরকম যেন চিত্তবৈকল্য আসে নি। কিন্তু নিরুপমার কৌতূহলের আতিশয্যে বিরক্ত হয়ে এক

ঝটকায় সব বলে ফেলল অজিত। আর বলতে পেরে বেশ খানিকটা তৃপ্তি বোধ করল। দুঃসংবাদটা হঠাৎ এমন করে মুখ থেকে বেরিয়ে না গেলে ভেবেচিন্তে সময় নিয়ে বললে বলা ভারি শক্ত হত। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে।

কলেজ থেকে ফিরে আসতে সেদিন বেশ একটু দেরি হয়ে গেল শীলার। সহপাঠিনী মীরা আর শিপ্রা কলেজ ছুটির পর তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমায়। শীলা কিছুতেই যাবে না। কিন্তু ওরা দুজন নাছোড়বান্দা। মীরা বলেছিল, 'এরপর তো তোর আর টিকিটি দেখা যাবে না। দুদিন বাদে একেবারে ঘরণী গৃহিণী হয়ে বসবি, তখন পারমিশন ছাড়া এক পা'ও কি কোথাও বাড়াবার জো থাকবে?' শিপ্রা বলেছিল, 'আরে না না, এ কি আর সেই আগেকার দিনের বিয়ে যে পতির অনুমতি ছাড়া হাঁচিটি পর্যন্ত দিতে পারবে না! সে আমল গেছে। এখন স্বাধীন ছেলের সঙ্গে স্বাধীন মেয়ের বিয়ে। কেউ কারো পরাধীন নয়।' মীরা হেসে বলেছিল, 'আরে রাখ রাখ। অমন কথা বিয়ের আগে সবাই বলে। কিন্তু বিয়ের পরে চেহারা চালচলন সব বদলে যায়। তখন একেবারে খাঁচার পোষা টিয়ে পাখিটি। আমার পিসতুতো বোন হেনাকে তো দেখছি ছ-মাস ধরে। বিয়ের আগে কি ছটফট ছটফটই না করেছে। এখন একেবারে কথাটি নট। ঘরে জাঁদরেল শাশুড়ী। হেনাকে পরীক্ষাটা পর্যন্ত দিতে দিলে না।'

শীলা জানে এসব বাধা তার বেলায় ঘটবে না। তার যিনি শাশুড়ী হবেন তাঁর মতামত উদার, স্বভাব কোমল। তিনি তার পড়াশুনোয় মোটেই বাধা দেবেন না। আর সুকুমার বলেছে শীলাকে সে এম. এ. পর্যন্ত পড়াবে। শুধু পড়াবেই না, শীলার সঙ্গে দ্বিতীয়বার

এম. এ. পরীক্ষা দেবে সুকুমার। শীলা যে সাবজেক্টে দেবে সেই সাবজেক্টে। দেখা যাবে কার রেজাল্ট কেমন হয়। দুজনে রাত জেগে একই ঘরে একই টেবিলে বসে পড়বে। কখনো পাশাপাশি কখনো মুখোমুখি, ভবিষ্যতের সেই মধুর পরিকল্পনায় মুখর হয়ে উঠেছিল সুকুমার।

শীলা মুখ টিপে হেসে বলেছিল. 'আগে বি. এ টা তো পাশ করতে দাও, তারপরে এম. এ.র ভাবনা। পরীক্ষার মাস তিনেক আগে আমি কিন্তু দাদার কাছে গিয়ে থাকব।'

সুকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন ?'

শীলা মৃদু হেসে বলেছিল, 'কেন আবার, ও সময় কাছাকাছি থাকলে পড়াশুনো যা হবে তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি .'

মীরা-শিপ্রাদের হাত কিছুতেই এড়াতে পারল না শীলা। দলে পড়ে যেতে হল সিনেমায়। টিকিটের দামটা অবশ্য ওরাই দিল। তারপর শো শেষ হওয়ার পর শীলাকে বাড়িও পৌঁছে দিয়ে গেল দুই বন্ধু।

বাড়িতে ফিরতে কদাচিৎ এত বেশী রাত হয় শীলার, যদিও অজিতের সঙ্গে যায় নি ক্লাসের দুটি মেয়ের সঙ্গেই সিনেমা দেখে এসেছে তবু লজ্জিত ভাবেই বাড়িতে ঢুকল শীলা। বেশী রাত হয়ে গেছে বলে মীরা আর শিপ্রা দুজনেই বাইরে থেকে বিদায় নিল। কড়ানাড়ার শব্দ শুনে জ্যোৎস্নাই দোর খুলে দিতে এসেছিল। শীলা ভিতরে ঢুকলে সেই আবার নিঃশব্দে দোর বন্ধ করে দিল।

তার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে শীলা ভাবল বউদি খুব রাগ করেছে। শুধু বউদি নয়, দাদা মা কেউই নিশ্চয়ই তার এত রাত অবধি বাইরে বাইরে থাকা পছন্দ করে নি। কদিন বাদেই যে মেয়ের বিয়ে, তার চালচলনটা একটু বেশী নিয়ন্ত্রিত হলেই ভালো হয়।

জ্যোৎস্নার মনের ভাব অনুমান করে শীলা লজ্জিত হয়ে কৈফিয়তের

স্বরে বলল, 'ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল বউদি, আমি যেতে চাই নি।'

জ্যোৎস্না বিরস ভঙ্গিতে বলল, 'তা গিয়েছ বেশ করেছ, তোমার তো এখন আনন্দ-স্ফূর্তির সময়।'

গলার স্বরটা কেমন যেন ভিন্ন রকম শোনাল। যা নিয়ে জ্যোৎস্না কটাক্ষ করল সেই বিয়ের উপলক্ষে আনন্দটা কি শুধু শীলার হয়েছে? বাড়িসুদ্ধ সকলের মনেই কি স্ফূর্তির ছোঁয়াচ লাগে নি? না হয় ক্লাসের দুটি মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে একটু বেশী রাতই করে ফেলেছে শীলা, তাই বলে বউদি অমন কাঠখোট্টা রূঢ় ভাষায় তাকে নিন্দা করবে, অমন শ্লেষ ব্যঙ্গ করে কথা বলবে? অবশ্য বিয়ের কথা উল্লেখ করে সুকুমারের সম্বন্ধে নানারকম ইঙ্গিত করে শীলার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা প্রায়ই করে জ্যোৎস্না। কিন্তু শ্লেষ আর তামাসা তো এক নয়।

জ্যোৎস্নার কথার কোন জবাব না দিয়ে শীলা দ্রুত পায়ে বাড়ির মধ্যে এগিয়ে গেল। ঘরে ঢুকতে যাবে, মুখোমুখি হয়ে গেল মার সঙ্গে।

নিরুপমা স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি এত রাত্রে? সুকুমারদের ওখানে?'

শীলার মুখে একটু লজ্জার আভা খেলে গেল। মুখ নীচু করে বলল, 'না সেখানে যাই নি। তুমি তো জানো সেখানে আজকাল আর যাইনে। বাণী-রাণীকে ওর একজন বন্ধু এসে পড়িয়ে যায়।'

বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার পর থেকে বিমলপ্রভাই শীলাকে বারণ করে দিয়েছেন, 'এ-কটা দিন তোমার আর পড়াতে এসে দরকার নেই মা। লোকে ঠাট্টা করবে। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর আবার এসে পড়িয়ো।' শীলা তাই মাসখানেক ধরে আর পড়াতে যায় না। কিন্তু

বাণী-রাণীর পড়াশুনোর অসুবিধা হয় বলে সুকুমার এক বেকার ভাইকে ওদের জন্যে টিউটর রেখে দিয়েছে।

একথা শুনে সেদিন বেড়াতে বেড়াতে শীলা ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে সুকুমারকে বলেছিল, 'কী এমন দোষ করেছি যে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে আমাকে ?'

সুকুমার প্রথমে কথাটা বুঝতে পারে নি, একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল, 'ছাড়িয়ে দিয়েছি মানে ?'

শীলা বলেছিল, 'ছাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কি। আমার টিউশনিটা প্রভাতবাবুকে দিয়ে দিলে। কেন, এই কটা দিন বাদে আমিই তো বাণী-রাণীকে পড়াতে পারতাম।'

সুকুমার বলছিল, 'না তা পারতে না। এর পরে বাণী-রাণীর দাদাকে পড়িয়ে ওদের পড়াবার ফের আর কি তোমার সময় থাকবে ?'

শীলা লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'আহা।'

মেয়েকে নিরুত্তর দেখে নিরুপমা রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? সুকুমারদের ওখানে যাস নি তো এই রাত্রে কোথায় গিয়েছিলি শুনি ?'

এবার আহত ভঙ্গিতে শীলা চোখ তুলে তাকাল। দুদিন বাদেই তো তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এ পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারে চলে যাচ্ছে সে, তবু আজও মা তাকে অমন কটু কথা বলবেন, অমন রূঢ় ভাষায় শাসন করবেন তাকে ! কেন, কী এমন দোষ করেছে সে ?

মায়ের কথার জবাবে শীলা এবার একটু দৃঢ় স্পষ্ট করেই বলল, 'এত রাত্রে তো আর যাই নি মা, গিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলায়। ফিরতে ফিরতেই একটু বা রাত হয়ে গেল। সিনেমা তো আজকাল আর দেখিই না, ক্লাসের দুটি মেয়ে নেহাতই জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাই—'

নিরুপমা শুকনো গলায় বললেন, 'সিনেমা দেখ, থিয়েটার দেখ, শখ যা আছে মিটিয়ে নাও, কাল থেকে তো আর ঘরে হাঁড়ি চড়বার ব্যবস্থা নেই।'

শীলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তার মানে? এসব তুমি কী বলছ মা?'

কিন্তু মেয়েকে নিজের কথার মানে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে নিরুপমা সেখানে আর দাঁড়ালেন না। সরে গেলেন সেখান থেকে।

শীলা জ্যোৎস্নার দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে বউদি?'

জ্যোৎস্না বলল, 'কিছু হয় নি। যা হয়েছে কাল শুনবে। হাতমুখ ধুয়ে এবার খাবে এসো।'

শীলা বলল, 'না বউদি, পায়ে পড়ি তোমার আগে বল কী হয়েছে। সবাই মিলে কেন এমন করছ তোমরা?'

জ্যোৎস্না বলল, 'বললাম তো কাল বলব। না বলে আর যাব কোথায়।'

শীলা বলল, 'আবার কালকের দোহাই দিচ্ছ কেন। যা বলবার আজই বলে ফেল। আমি সবরকম দুঃসংবাদ শোনার জন্যেই তৈরী আছি।'

জ্যোৎস্না ননদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'তুমি তৈরী থেকে কতদূর কি করতে পারবে শীলা? তুমি তো দুদিন বাদেই পর হয়ে যাচ্ছ। এ সংসারের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে আসতে হবে না।'

শীলা বলল, 'আসতে হবে কি হবে না সে কথা আমি বুঝব। কিন্তু তুমি পরিষ্কার করে বল তো কী হয়েছে।'

জ্যোৎস্না বলল, 'কী হয়েছে তোমার দাদার কাছে শোন গিয়ে যাও।'

শীলা বলল, 'তোমার কাছে শোনাও যা দাদার কাছে শোনাও তাই। দাদার চাকরি-বাকরি নিয়ে কি যেন গোলমাল—'

কথা শেষ না করে থেমে গেল শীলা।

জ্যোৎস্না বলল, 'না, আর কোন গোলমাল নেই। সব গোলমাল মুরারিবাবু পরিষ্কার করে মিটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অফিসে তোমার দাদাকে আর চাকরি করতে হবে না স্পষ্টই বলে দিয়েছেন তিনি।'

শীলা বলল, 'কেন, দাদার অপরাধ ?'

জ্যোৎস্না একটু হাসল, 'অপরাধ তোমার বিয়ের জন্যে হাজার খানেক টাকা আগাম দেওয়ার জন্যে তোমার দাদা তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আর তো কোন অপরাধ দেখিনে।'

শীলা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলল, 'মিথ্যে কথা। শুধু এর জন্যে কারো চাকরি যায় না, যেতে পারে না।'

জ্যোৎস্না বলল, 'পারে কি না পারে সেকথা তোমার দাদার কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ো। আমি যা শুনেছি তাই তোমাকে বললাম। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। কাপড় ছেড়ে তুমি তাড়াতাড়ি এসো।'

শীলা আর কোন কথা না বলে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। মেঝেয় পাতা বিছানার ওপর সন্তু নন্তু দুভাই এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়ই ঘুমকাতুরে ওরা। এমন বিপদের দিনেও ওদের চোখে ঘুমের অভাব নেই। ওদের দোষ কি। কিইবা ওদের বয়স। কিন্তু শীলা কি আজ খেয়েদেয়ে এসে অমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে ? তার বিয়ের জন্য টাকার জোগাড় করতে গিয়েই দাদার চাকরি গেছে একথা শোনার পরও কি শীলার চোখে ঘুম আসবে, খাওয়ার রুচি আসবে ? কিন্তু রুচি না এলেও জ্যোৎস্নার বারবার ডাকাডাকিতে রান্নাঘরে গিয়ে

খেতে বসতে হল শীলাকে। কোন রকমে দুটি খেয়ে নিয়ে অজিতের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। নিরুপমা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, আজ আর ওসব আলাপ করে কাজ নেই, আর করে লাভই বা কি, অনেক বলা-কওয়ার পর দুটি মুখে দিয়ে এসে শুয়ে পড়েছে। বোধ হয় তন্দ্রার মত এসেছে একটু। তুই তোর ঘরে যা।'

শীলা বুঝতে পারল তন্দ্রা-টন্দ্রা কিছু নয়, দাদা অমনিই চুপ করে পড়ে রয়েছে, নিজের মনেই আকাশ-পাতাল ভাবছে।

বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও অজিত তার সঙ্গে ইদানীং বন্ধুর মত ব্যবহার করে আসছে। শীলা আশা করেছিল অজিত আজও তাই করবে। নিজেই ডেকে নিয়ে শীলাকে সব কথা সে জানাবে। এই পারিবারিক বিপদে শীলারও সে পরামর্শ চাইবে। কিন্তু দাদা কেন তাকে আর আগের মত কাছে ডাকছে না! কেন অমন করে দূরে সরে রয়েছে! শীলা তার চাকরি যাওয়ার উপলক্ষ্য বলে? দুদিন বাদে শীলা পর হয়ে যাচ্ছে বলে? কিন্তু অজিত কি সত্যই বিশ্বাস করে, বিয়ে হলেই শীলা পর হয়ে যাবে! তার মনে দাদা বউদি ভাইপো ভাইঝি কারো ওপরই আর কোন মমতা থাকবে না?

নিজেদের শোবার ঘরে ফিরে গেল শীলা। চেয়ার টেনে ছোট্ট টেবিলটার ধারে গিয়ে বসল। খানিকক্ষণ এ বই সে বই নাড়াচাড়া করল। কিন্তু কোন বইতেই মন বসল না।

নিরুপমা বার কয়েক তাগিদ দিলেন 'হয়েছে পড়াশুনো, আবার কাল ভোরে উঠে পড়িস, এখন শুয়ে পড়।'

বলে তিনি নিজেই শুয়ে পড়লেন। এত চিন্তা ভাবনা সত্ত্বেও ঘুমোতে তাঁর বেশি সময় লাগল না। ছেলেমেয়েদের আলো-জ্বালা পড়বার ঘরে ঘুমোনো তাঁর অভ্যাস আছে।

কিন্তু ঘুম এল না শীলার চোখে। ঘুম যদি না পায় বিছানায় শুতে গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে বসে বসে চিঠি লেখা ভালো। শীলা দেরাজের ভিতর থেকে নীলাভ রঙের প্যাডটা আস্তে আস্তে বের করে নিল।

কিন্তু চিঠি লিখতে চাইলেই কি সব সময় লিখতে পারা যায়? নীলাভ পাতলা কাগজের ওপর ফাউণ্টেন পেনের সূক্ষ্ম ডগা দিয়ে শীলা অনেকক্ষণ ধরে আঁকি-বুকি করল আর ভাবল কী লিখব, কী করে লিখব। সুকুমারকে মনের কথা জানানো যত সহজ মনে হয়েছিল লিখতে গিয়ে দেখল তত সহজ নয়। তবে শীলা একথা স্থির করে ফেলল যে এখন আর তার বিয়ে সম্ভব হবে না। আর সে কথা সুকুমারকে যত তাড়াতাড়ি জানানো যায় ততই ভালো, কিন্তু কী ভাবে লিখবে কথাটা! কোন মুসাবিদাই শীলার পছন্দ হয় না; আরো খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শেষে লিখল, 'তোমার সঙ্গে ভারী দরকারী কথা আছে, কাল বিকাল পাঁচটায় পার্কের পশ্চিম দিকে আমার জন্মে অপেক্ষা কোরো।'

এই দু ছত্র লেখার পর মনে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল শীলা; হ্যাঁ, যা বলবার সাক্ষাৎমত বলাই ভালো। চিঠিতে হয়তো সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে না শীলা। হয়তো সুকুমার তাতে ভুল বুঝবে; তার চেয়ে দেখা হলে শীলা তাকে সব কথা খুলে বুঝিয়ে বলবে। তাদের এই পারিবারিক বিপদের কথা সুকুমার নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবে। সহানুভূতিতে ভরে উঠবে তার মন। সুকুমারের ভালোবাসা, তার সহৃদয়তার কথা ভাবতে ভাবতে শীলা খানিকক্ষণ বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে উঠেই প্রথমেই চিঠিটা পোস্ট করবার কথা মনে হল শীলার। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল ডাকে চিঠি দিলে সুকুমার তা আজ নাও পেতে

পারে, যদিও একই শহরের মধ্যে এমনকি বলতে গেলে একই পাড়ার মধ্যে দুজনের বাসা তবু চিঠিটা আজই বিকালে যে সুকুমার ডাকপিয়নের হাত থেকে পাবে এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। এবং প্রায়ই দেখা গেছে ডাকে দেওয়া শীলার চিঠি দেরিতে গিয়ে পৌঁছেছে সুকুমারের হাতে; কিন্তু আজ তো আর দেরি হলে চলবে না। আজ তার সঙ্গে দেখা করা শীলার বড়ই দরকার।

একটু ইতস্তত করে সন্তুকে ইসারায় কাছে ডাকল শীলা। প্রথমে কথাটা পাড়তে ভারি লজ্জা বোধ করল। শত হলেও নিজের ছোট ভাই, তার হাত দিয়ে সুকুমারকে চিঠি পাঠানো তেমন শোভন রুচিসঙ্গত বলে মনে হল না শীলার। সন্তু না জানে কি, না বোঝে কি, দুদিন বাদে সুকুমারের সঙ্গে শীলার বিয়ে হবে এ কথা তো সকলেই জানে। এত জানাজানি হবার পরেও ছোট ভাইয়ের হাত দিয়ে তাকে চিঠি পাঠানো কি ভালো দেখাবে। চোদ্দ-পনের বছর বয়স হয়েছে সন্তুর। ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। চিঠিটা খুলে দেখবার যদি কৌতূহল হয় ওর।

'কি জন্যে ডেকেছ ছোড়দি? কী ভাবছ অত?' সন্তু জিজ্ঞাসা করল।

ছোট ভাইয়ের শান্ত, স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কা দৃঢ় হল শীলার। না সন্তু তেমন দুষ্টু ছেলে নয়। বৃথাই সে ভেবে মরছিল। ওর হাতে শীলার গোপন চিঠির মর্যাদা নষ্ট হবে না।

শীলা সন্তুর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল, 'চিঠিটা দিয়ে আসতে পারবি?'

কাকে দিতে হবে সে কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ খামের ওপর ঠিকানা লেখা না থাকলেও নামটা ঠিকই লেখা আছে।

না থাকলেও সন্তুর তা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হত না। এ সময় সুকুমারদাকে ছাড়া ছোড়দি আর কাকে চিঠি লিখবে।

সন্তু শীলার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, 'কেন পারব না ছোড়দি। এক্ষুনি ছুটে গিয়ে দিয়ে আসব।'

সন্তুর হাতে চিঠিটা দিতে না দিতে নন্তু এসে সেখানে হাজির। 'ওকে কী দিলে ছোড়দি, চিঠি বুঝি?'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ।'

নন্তু বলল, 'কেন, আমি বুঝি চিঠিটা দিয়ে আসতে পারতাম না?

শীলা হেসে বলল, 'আমি কি বলেছি পারতিসনে! সন্তুকে সামনে দেখলাম তাই ডেকে ওর হাতেই দিলাম চিঠিখানা। যেতে চাস তুইও যা না ওর সঙ্গে।'

নন্তু বলল, 'ইস আমি বুঝি শুধু হাতে যাব। আমাকে তাহলে আর একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি সেই চিঠি নিয়ে যাই।'

শীলা হেসে বলল, 'তুই তো আচ্ছা ছেলে। তুই খালি হাতে যেতে পারবি না বলে আমি বুঝি আর-একখানা চিঠি লিখতে বসব?'

নন্তু বলল, 'কেন, তা বুঝি লেখা যায় না, না?'

শীলা হাসি চেপে বলল, 'যায় না'ক? তুই পারিস লিখতে?'

নন্তু বলল, 'পারিনে তবে? আমি ইচ্ছা করলে অমন একশ চিঠি দিনের মধ্যে লিখে ফেলতে পারি।'

শীলা বলল, 'তাই নাকি? ভারি বাহাদুর ছেলে তো। আচ্ছা, বড় হয়ে লিখিস।'

সন্তু চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেলে শীলা অজিতের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে নিরুপমা ছেলে আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে নীচু গলায় কি আলাপ করছিলেন; শীলাকে দেখে চুপ করে গেলেন। অজিত আর জ্যোৎস্নাও

মুহূর্তকাল গম্ভীর হয়ে রইল। শীলার নতুন করে মনে পড়ল দাদার চাকরি গেছে। অভাব-অনটনের সংসার, এবার অচল হয়ে পড়বে সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতক্ষণ নন্তু-সন্তুকে নিয়ে-হাসি ঠাট্টা করবার সময় শীলা যেন তা ভুলে রয়েছিল। যেন সম্পূর্ণ অন্য জগতে ছিল শীলা। সেখান থেকে ফের এই-দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে উপস্থিত হয়েছে।

অজিতই প্রথমে কথা বলল, 'আয় শীলা, বোস এসে এখানে।' তারপর জোর করে একটু হাসি টেনে বলল, 'ব্যাপারটা সব শুনেছিস বোধ হয়।'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ শুনেছি। তুমি নিজে তো আর বল নি। মা আর বউদির মুখ থেকেই সব শুনে নিলাম।'

অজিত বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে। শুনলেই হল। এমন কিছু সুসংবাদ তো নয় যে সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে হবে।'

অজিতের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিন্তু একরকম ভালোই হয়েছে দাদা। এবার সত্যি সত্যি তুমি ভালো চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবে। ও কাজ তোমার মোটেই যোগ্য ছিল না।"

জ্যোৎস্না সায় দিয়ে বলল, 'আমিও তাই বলি। এ তোমার শাপে বর হয়েছে।'

অজিত বলল, 'তা তো হয়েছে। কিন্তু এখনকার সমস্যাটা কি করে মেটাই! যতদিন না অন্য কাজকর্ম কিছু একটা জোটে ততদিন এটা একেবারেই শাপ, একটুও বর নয়।'

জ্যোৎস্না রেগে উঠে বলল, 'এতই যদি আক্ষেপ তাহলে মুরারিবাবুর সঙ্গে অমন চেঁচামেচি না করলেই হত? তখন মনে ছিল না মনিবের সঙ্গে কথা বলছ! যার চাকরি কর তার সামনে অত তেজ দেখাতে নেই জেদ দেখাতে নেই সে কথা মনে ছিল না তখন!'

নিরুপমা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। ছেলে-বউয়ের ঝগড়ায় এবার উত্যক্ত হয়ে বললেন, 'থাম বউমা, থাম। সর্বক্ষণ কি চেঁচামেচি মানুষের ভালো লাগে। সময় নেই, অসময় নেই, তোমাদের লঘুগুরু জ্ঞান নেই, ঝগড়া লেগেই আছে তোমাদের। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার। কাল যখন অফিসে বেরোবার মুখে অমন ঝগড়া-বিবাদ করে গেল আমি তখনই বুঝেছি একটা অঘটন কিছু ঘটবে। মেয়েমানুষের এত বাড় কি সয়।'

জ্যোৎস্না বলল, 'হ্যাঁ, আপনি তো আমার বাড়ই দেখেন, সংসারে যত দোষ তো কেবল আমারই। আর সবাই এখানে গুণের নিধি।'

শাশুড়ীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করে জ্যোৎস্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিরুপমা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুনলে? তোমরা শুনলে সবাই? কথার 'ছিরি'খানা দেখলে একবার?'

এবার অজিতও ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ করো মা, চুপ করো। নতুন করে কি দেখবে শুনবে? ওর স্বভাব কী রকম তা তো জানোই। তা মরলেও শোধরাবে না। এবার যে সমস্যায় পড়া গেছে সে কথা ভাব। এই সঙ্কট থেকে কি করে উদ্ধার পাবে সেই চিন্তা কর সবাই মিলে। চেঁচামেচি ঝগড়া-ঝাঁটি করে কি কিছু লাভ হবে?'

নিরুপমা একটুকাল চুপ করে থেকে অভিমানের সঙ্গে বললেন, 'আমার আর চিন্তা-ভাবনার কী আছে। এ সংসারে কারো সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। কেউ তো আর আমার আপন নয়, সবাই পর। কার জন্যে আমি চিন্তা করতে যাব।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট দুটি ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে নিরুপমাই ফের বললেন, 'কাল সারারাত যদি

একবার চোখ বুজতে পেরে থাকি। কেবল এপাশ ওপাশ করেছি আর ভেবেছি ভগবান এ কি পরীক্ষায় ফেললেন আমাকে! দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে, এই সময় এমন বিপদ। জাত মান কি করে রাখব। এখন পর্যন্ত টাকাপয়সা কিছু জোগাড় হল না। একটা জিনিস পর্যন্ত ঘরে এসে ওঠে নি।'

শীলা হঠাৎ বলে উঠল, 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মা। এ তারিখে বিয়ে হতে পারে না।'

গুরুজনদের সামনে নিজের বিয়ের কথাটা মুখে বলে ফেলে শীলা একটু লজ্জিত হল। কিন্তু উপায় নেই। লজ্জা সংকোচের দোহাই মেনে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সমস্ত পরিবারটি যে সঙ্কটে পড়েছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে শীলাকে এগিয়ে আসতে হবে।

মেয়ের কথায় দোষ ধরলেন না নিরুপমা। এই বিপদের সময় কারো চলন-বলনের অত চুল-চেরা হিসাবের দিকে মন দেওয়ার সময়ও থাকে না, ইচ্ছাও থাকে না। মেয়ের কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বল কি। কিন্তু তারিখ পিছিয়ে দিতে তারা কি রাজী হবে? তারা যে চিঠিপত্র ছাপিয়ে দিয়ে খবরাখবর চারদিকে দিয়ে ফেলেছে।'

শীলা বলল, 'দিয়ে ফেলেছে তো কী হয়েছে? দরকার হলে বিয়ের তারিখ সকলেই বদলায়। তা ছাড়া ব্যাপারটা যদি শোনেন তাঁরা নিজেরাই তারিখ বদলাতে বলবেন। আমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা কি তাঁরা ভেবে দেখবেন না মনে কর?'

বোনের সংকোচহীনতায় অজিত একটু বিস্মিত হল। তারপর মার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'দেখছ মা, এখনো বিয়ে হয় নি, শীলা এরই মধ্যে কেমন শ্বশুর-বাড়ির পক্ষ টেনে কথা বলতে শুরু করেছে। তাহলে তুই-ই একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে বল শীলা। দিনটা কিছু পিছিয়ে

দিতে পারলেই ভালো হয়। এমন একটা কাণ্ড ঘটবে তা তো আর জানিনে। একেবারে অপ্রত্যাশিত।'

শীলা অজিতকে ভরসা দিয়ে বলল, 'তুমি ভেব না দাদা। যা বলবার আমিই ওঁদের বলব। আমাদের অবস্থার কথা শুনলে ওঁরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। মানুষমাত্রেই করে।'

বোনের কথায় অজিত একটু ভরসা পেল। ভাবী কুটুম্বের কাছে চাকরি যাওয়ার সংবাদটা নিজের মুখে বলতে তার কেমন যেন একটু সংকোচ হচ্ছিল। এ অবস্থায় বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন করা তার পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য অথচ সে কথা অন্যের কাছে মুখ ফুটে বলতে সম্মানে লাগে, পৌরুষে বাধে। শীলা যদি সুকুমারকে বলেকয়ে বিয়ের দিনটা আরো দু-এক মাস পিছিয়ে দিতে পারে তাহলেই সব দিক রক্ষা পায়। না পাবার কোন কারণ নেই, এ বিয়ে ওরা নিজেরাই ঠিক করেছে। দিন-ক্ষণও ওদের পছন্দমত হবে। এ বিয়েতে বরকনে নিজেরাই প্রধান। দুপক্ষের অভিভাবকেরা উপলক্ষ। খানিক বাদেই বোনের বিয়ের ভাবনা ছেড়ে নিজের চাকরির কথা চিন্তা করতে লাগল অজিত। এতদিনের চাকরি যে এমন সামান্য কারণে এক কথায় যেতে পারে তা যেন ধারণাই করা যায় না। আসলে নিজের সম্বন্ধীটিকে তক্তে বসাবার ইচ্ছা ছিল মুরারিবাবুর। কালকের ঘটনাকে উপলক্ষ করে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে নিজের সেই ইচ্ছাকেই তিনি পূর্ণ করেছেন। কিন্তু অজিতও এত সহজে ছাড়বে না; দু-এক মাসের মাইনে কিছুতেই নেবে না ক্ষতিপূরণ হিসাবে, মোটা টাকা, অন্তুতপক্ষে ছমাসের মাইনে, আদায় করে ছাড়বে।

একটু বাদে শীলা উঠে দাঁড়াল। সন্তুর গলা শোনা যাচ্ছে। সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা, চিঠিটা হাতে পেয়ে সে কী বলেছে জানবার

জন্যে ভারি উৎসুক হয়ে উঠল শীলা। যাওয়ার আগে দাদার করুণ মুখখানা আর একবার চোখে পড়ায় শীলা ফের একটু থমকে থেমে দাঁড়াল। দাদার দুশ্চিন্তা দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তার। আশ্বাস আর সান্ত্বনার ভাষা যেন আপনিই মুখ থেকেই বেরিয়ে এল। শীলা মমতাভরা কণ্ঠে বলল, 'অত ভেব না দাদা, আমি তো আছি।'

কথাটা বলে প্রথমে লজ্জা পেল শীলা। সে এখনো কলেজের ছাত্রী, উপার্জনের চেষ্টা করে নি, তেমন কোন ক্ষমতাও এখনও পর্যন্ত হয় নি। তাছাড়া দুদিন বাদে সে অন্য সংসারে অন্য পরিবারে চলে যাচ্ছে। বেকার দাদাকে এত বড় আশ্বাস দেওয়ার অধিকার কি তার আছে? তবু আশ্বাস দিতে পেরে ভালো লাগল শীলার। কথা কটি উচ্চারণ করে সে নিজেই ভারি তৃপ্তি আর শান্তি পেল। সেই সঙ্গে মনে মনে স্থির করল এ কথাকে শুধু মুখের কথায় পর্যবসিত হতে সে দেবে না, যেখানেই থাকুক যেভাবেই থাকুক দুঃসময়ে দাদাকে সে সাধ্যমত সাহায্য করবে।

পার্কের পুব-দক্ষিণ কোণের নির্দিষ্ট বেঞ্চিটা ফাঁকাই ছিল। শীলা পাঁচটার আগেই সেখানে এসে বসল। সুকুমার তখনও এসে পৌঁছায় নি। একেকটি মিনিট যেন একেকটি যুগ। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। শীলা উঠে একটুকাল রেলিং ধরে দাঁড়াল। পার্কের পাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। কেউ কেউ শীলার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গেল। শীলা বিরক্ত হয়ে ফের এসে বেঞ্চের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল। আরো কিছুক্ষণ বসে বসে সুকুমারকে দেখা গেল। সে স্মিতমুখে শীলার পাশে এসে বসে বলল, 'কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব যে?'

শীলা হাসল না, গম্ভীর মুখে বলল, 'আগে বল, আসতে এত দেরি করলে কেন? এই তোমার পাঁচটা?'

সুকুমার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না ঠিক পাঁচটা না,

পাঁচটা বেজে মিনিট বার হয়েছে। তোমার বোধ হয় মনে হচ্ছিল বার বছর, তাই না ?'

শীলা তেমনি গম্ভীর মুখে বলল, 'এত দেরি করলে কেন ?'

সুকুমার হেসে বলল, 'বিয়েতে কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে মা তার লিস্ট তৈরী করছিলেন। সেই তালিকায় আমায় কয়েকজন বন্ধুর নামও করে দিতে হল।'

শীলা বলল, 'নিমন্ত্রণের চিঠি এখনও পাঠানো হয় নি তো ?'

সুকুমার বলল, 'না। খুব যে গরজ দেখছি।'

শীলা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক। গরজ তো আছেই। গরজ না থাকবার তো কোন কথা নেই।' তারপর একটুকাল থেমে চুপ করে বলল, 'শোন, চিঠিগুলি যদি না ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে এখন আর ছাড়ার দরকার নাই।'

সুকুমার তরল স্বরে বলল 'কেন, আমি তোমাকে গরজের খোঁটা দিয়েছি বলে ?'

শীলা বলল, 'না সেজন্যে নয়। বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে হবে। এ তারিখে বিয়ে আমাদের হতে পারবে না।'

শীলার কথা শুনে সুকুমার তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'কেন ? একথা বলছ যে।'

শীলা বলল, 'সে অনেক কথা। তোমাকে সব বলব বলেই এখানে ডেকে এনেছি।'

তারপর আস্তে আস্তে সব কথাই শীলা সুকুমারকে খুলে বলল। অজিতের চাকরি যাওয়ায় যে পারিবারিক বিপর্যয় ঘটেছে, শীলারা যে গুরুতর অর্থসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সুকুমারের কাছে তার কোন কথাই গোপন করল না শীলা।

সুকুমার সব শুনে সহানুভূতির সুরে বলল, 'এ সময় অজিতবাবুর হঠাৎ এ ভাবে চাকরি যাওয়াটা সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার শীলা। এমন যে ঘটবে তা আমরা কেউ আশঙ্কাই করতে পারি নি। কিন্তু তারিখ বদলানোটা কি সত্যই সম্ভব হবে?'

শীলা বলল, 'কেন, সম্ভব না হবেই বা কেন। এ তো কনে বদল হচ্ছে না, তারিখই শুধু বদলাতে হচ্ছে।'

সুকুমার বলল, 'তোমার ভাবখানা যেন সেইরকমই। যেন এ ব্যাপারের সবটাই তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে।'

শীলা প্রতিবাদ করে বলল, 'মিথ্যে কথা। আমার একার ইচ্ছাই সব একথা আমি মোটেই বলি নি। আমি বলেছি ব্যাপারটা যখন দুজনের, তখন দুজনের সুবিধে-অসুবিধের কথাই ভেবে দেখতে হবে।

সুকুমার বলল, 'একথা তুমি মুখে বলছ বটে কিন্তু আসলে তোমার মনের ইচ্ছে আমরাই শুধু তোমাদের পরিবারের সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবব, আর তোমরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

শীলা বলল, 'এতদিনের আলাপ-পরিচয়ের পর তোমার যদি এরকম ধারণাই আমার সম্বন্ধে হয়ে থাকে তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমি এবার উঠব। অন্য কাজ আছে। তোমার বাবাকে বলে তারিখটা যেভাবে হোক বদলাতে হবে।'

বলে শীলা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সুকুমার বলল, 'বাবাকে আমি বলতে পারি, কিন্তু তিনি আমার কথা রাখবেন কিনা তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শীলা অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে বলল, 'রাখবেন কিনা মানে। যাঁর মধ্যে এক ফোঁটা যুক্তি বুদ্ধি আছে তিনিই এ ব্যাপারে আমাদের অনুরোধ রাখতে বাধ্য।'

শেষ শব্দটা খট করে কানে লাগল সুকুমারের। আস্তে আস্তে বলল, 'বাধ্য !'

শীলা বলল, 'তিনি আমার বাধ্য হবেন সে কথা বলি নি। কিন্তু যুক্তি বুদ্ধি মানুষমাত্রেই মেনে চলে।'

সুকুমার বলল, 'তা অবশ্য চলে। কিন্তু লোকে ভাবে তার নিজের যুক্তিটাই একমাত্র যুক্তি, তার চেয়ে বড় বুদ্ধি আর কারো ঘটে নেই।'

শীলা বলল, 'কোন কোন লোকের সে রকমই যে ধারণা তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।'

সুকুমার আর মিছে তর্ক না করে গম্ভীর হয়ে রইল।

দুজনে পার্ক থেকে একসঙ্গেই বেরোল, কিন্তু সুকুমার গম্ভীর ভাবে বলল, 'ঠাট্টার কথা নয় শীলা। এর মধ্যে পারিবারিক মান-সম্মানের প্রশ্ন আছে।'

শীলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল 'মান-সম্মান? আমাদের যেখানে জীবনধারণের প্রশ্ন, সেখানে মিথ্যে মান-সম্মানের কথাটাই তোমার কাছে এত বড় মনে হল?'

কথাটা বলে সুকুমার একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল কিন্তু শীলা অমন রূঢ় তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করায় সেই লজ্জিত ভাবটুকু সুকুমারের মনে এক মুহূর্তও স্থায়ী হতে পারল না। সেও বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'জীবনমরণ! মার্চেন্ট অফিসের অমন সাধারণ একটা চাকরি যাওয়াকে আমি জীবনমরণের প্রশ্ন বলে মনে করিনে শীলা।'

শীলা মুহূর্ত কাল বিস্মিত হয়ে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার কাছে তা মনে না হতে পারে। কিন্তু যাকে ওই চাকরির ওপর নির্ভর করে আট-দশটি পোষ্যের খোরাক পোশাক চালাতে হয় তার কাছে ব্যাপারটা জীবনমরণের চেয়ে নেহাত

কম না। কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে। এসব কথা তোমাকে না বলাই উচিত ছিল।'

সুকুমার বলল, 'তাই যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, কেন বললে?'

শীলা বলল, 'কেন বললাম তা তুমি জান। যে ভাবেই হোক বিয়ের তারিখটা তোমাদের বদলাতেই হবে। যতদিন না দাদার চাকরি বাকরির একটা সুবিধে হয় ততদিন বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

সুকুমার বলল, 'তোমার কথাটা যুক্তিহীন গোছের মত শোনাচ্ছে। তোমার দাদার চাকরি যদি ছমাসে না জোটে, দু বছরে না জোটে ততদিন আমাদের বিয়ে হবে না?

শীলা বলল, 'আমারও তাই ইচ্ছে। যতদিন দাদার তেমন একটা সুবিধা-সুযোগ না হয়, ততদিন আমি যেমন করে পারি তাকে সাহায্য করব।'

সুকুমার বলল, 'বেশ কথা। কিন্তু বিয়ে তো শুধু তোমার ইচ্ছাতেই হবে না। এ ব্যাপারে আরো একজনের ইচ্ছে-অনিচ্ছেও আছে।'

শীলা বলল, 'আমি কি বলছি নেই?'

সুকুমার চুপ করে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

অন্যদিনের মত আজ আর দুজনে একই পথে চলল না। খানিকটা এগিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছে। এতদিন তারা পরস্পরের যে পরিচয় পেয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে তার সবটুকুই সত্য নয়, খাঁটি নয়। তাদের ভালোবাসার মধ্যে অনেক খাদ মেশানো রয়েছে।

বিশেষ করে আজকের ব্যবহারটা সুকুমারের কাছে বড়ই আপত্তিকর মনে হতে লাগল। একফোঁটা বিনয় নেই, নম্রতা নেই, শুধু দম্ভে আর

অহঙ্কারে ভরা শীলার মন। তারিখ বদলাতেই হবে। যেন তার দাবি, তার জোরই সবচেয়ে বেশি। আর কোন পরিবারের সুবিধে-অসুবিধের কথা সে ভেবে দেখতে একটুও রাজী নয়। তারিখ বদলানো যাবে না কেন, খুবই যায়। কিন্তু সে কথা বলবারও তো একটা ধরন আছে। তারিখ বদলাবার প্রস্তাবটা যখন শীলাদের দিক থেকেই এসেছে তখন শীলার কি উচিত ছিল না শোভন সংযত ভাবে সুকুমারকে সব কথা জানালো? শীলা কি ভেবেছে সুকুমার তাকে ভালোবাসে বলে তার সব রকম অন্যায় জেদ আর ঔদ্ধত্যও সহ্য করবে?

বাড়ি ফিরে এসে সুকুমার মাকে সব কথা বলল। শীলার আচরণে সে যে অসন্তুষ্ট এমন কি অপমানিত হয়েছে সে মনোভাবও মার কাছে সে গোপন করল না। বিমলপ্রভা সব শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তাই তো, বড়ই ভাবনার কথা হল। এদিকে সব প্রায় ঠিকঠাক, চিঠিপত্রে কাউকে কাউকে জানানোও হয়েছে। এখন যদি তারিখ পিছিয়ে দেওয়া যায়—আচ্ছা, আসুন উনি, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।'

শশধরবাবু ফিরে সব শুনে প্রথমে বললেন, 'উঁহু, তা হবে না। আমার কথার নড়চড় আমি করতে পারব না। আমি যে তারিখ ঠিক করেছি সেই তারিখেই ছেলের বিয়ে দেব। লোকের কাছে আমার বুঝি একটা মান সম্মান নেই।'

বিমলপ্রভা মৃদু হেসে বললেন, 'নেই আবার! কত বড় মানী লোক তুমি! কিন্তু ওদের কথাটাও তো ভেবে দেখতে হবে। আহা! এ বাজারে বেচারার যদি চাকরি গিয়ে থাকে তাহলে অতগুলি পোষ্য নিয়ে কী উপায় হবে বল তো।'

শশধরবাবু বললেন, 'সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি বোনকে তার পাত্র

করে দেওয়া উচিত। আর কিছু না হোক একটি পোষ্য তো অন্তত কমবে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'পার করে দিতে পারলে যে ভালো হয় সে কথা তুমিও বোঝ আমিও বুঝি, কিন্তু পারের কড়ি জোগাড় করা চাই তো। একটা বিয়েতে খরচ-পত্তর কি কম? শীলার দাদা বোধ হয় এখন পর্যন্ত টাকার জোগাড় করে উঠতে পারে নি।'

সুকুমার পাশের ঘর থেকে সব শুনছিল। উঠে এসে আস্তে আস্তে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, 'বেশ তো, খরচ-পত্রের এতই যদি টানাটানি হয়ে থাকে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হোক। কিছুই তাদের দিতে হবে না, আয়োজন-অনুষ্ঠানেরও দরকার হবে না কোন।'

শশধরবাবু ছেলের নির্লজ্জতায় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন তারপর বললেন, 'হুঁ, সেইটুকুই বাকি আছে। তাহলেই ষোল কলা পূর্ণ হয় একেবারে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'রেজিষ্ট্রি করবার কী দরকার। তারিখ যদি না বদলানোই তোমরা ঠিক করে থাক তারা শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিক মেয়ের। পরে সাধ্য হয় জিনিসপত্র তারা দেবে, না পারে না দেবে। মনে করব গরিবের ঘরের মেয়ে এনেছি। জিনিসপত্রের জন্যে ভাবনা কি। ক্ষমতা থাকে জিনিসপত্র নিজের রোজগারের টাকাতেই সুকুমার করে নিতে পারবে।' কিন্তু শশধরবাবু এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন না। বললেন, 'হুঁ, মা-ছেলে মিলে আমাকে পথে বসাতে চাইছ তোমরা। আমি সব জেনেশুনে এই তারিখেই ছেলের বিয়ে দিই আর সমস্ত খরচ আমার ঘাড়ে চাপুক। তা আমি পারব না। অত সস্তা টাকা নেই আমার কাছে।'

পরদিন সকালে শশধরবাবুই খবর দিয়ে পাঠালেন অজিতকে। অবিলম্বে যেন তাঁর সঙ্গে অজিত দেখা করে। জরুরী কথা আছে।

খবর পেয়েই অজিত শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা করল। তিনি খুবই সহানুভূতির সঙ্গে সব কথা শুনলেন। মুরারি বসাকের দুর্ব্যবহারের জন্যে তাকে গালাগাল দিলেন। ব্যাপারটা সহজে ছেড়ে না দিয়ে লেবার কমিশনে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন অজিতকে। তারপর নিজেই বললেন, অজিতের যখন এই বিপদ তখন বিয়েটা আপাতত স্থগিতই থাক। মনের অশান্তি নিয়ে কি কোন শুভ কাজে হাত দেওয়া যায়। শশধরবাবু এখনও নিমন্ত্রণের চিঠিপত্র ছাড়েন নি, যে কজন বন্ধু বান্ধবকে মুখে মুখে বলেছেন তারিখ বদলাবার কথা তাদের জানিয়ে দিলেই হবে। এমন কত হয়, জন্মের অশৌচ মৃত্যুর অশৌচের জন্যে কত বিয়ে এমন পিছিয়ে যায়। আজকালকার দিনে চাকরি যাওয়াটাও প্রায় পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের সমান। শশধরবাবু অবশ্য অজিতের চাকরি যাওয়ার কথা কাউকে বলবেন না। তার কোন জেঠী-খুড়ীর মারা যাওয়ার কথাই সবাইকে জানিয়ে বলবেন। অজিতের কোন সম্মানহানির আশঙ্কা নেই।

সমস্যার এমন করে যে সমাধান হবে তা অজিত ধারণাই করতে পারে নি। শশধরবাবুর মহত্ত্ব দেখে সে বিস্মিত এমন কি অভিভূত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, লোকে তাহলে শশধরবাবুর সম্বন্ধে যা বলে তা অবিকল ঠিক নয়। মানুষকে অত সহজে চেনা যায় না।

শীলার বিয়ের ব্যাপারে শশধরবাবু অজিতকে যে ভরসা দিয়েছিলেন তাতে মনে হয়েছিল দু-তিন মাসের জন্য বিয়েটাই বুঝি শুধু থেমে রইল। কিন্তু তিন মাস পরে মনে হচ্ছে শুধু বিয়ে নয়, শীলাদের সংসারে সব কিছুই বুঝি থেমে গেছে, থেমে আসছে। অবশ্য অজিতের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি নেই। পুরোনো বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা যোগাড় করে তাদের

অফিসে গিয়ে ঢুঁ মেরেছে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বেপরোয়া দরখাস্ত ছেড়ে চলেছে, হাল ছেড়ে বসে থাকবার লোক নয় অজিত। যোগ্যতা যখন আছে, দু কলম ইংরেজি যখন লিখতে পারে তখন একটা কিছু জুটে যাবেই। ভাবনা শুধু মাঝখানের কটা দিন নিয়ে। চাকরি ছাড়ার পর মুরারিবাবুর কাছ থেকে একেবারে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়েছে—নোটিশ পিরিয়ডের টাকা, এমন কি শেষ মাসের মাইনের ন্যায্য টাকাটা পর্যন্ত ছেড়ে এসেছে। কিন্তু তাই বলে মুরারি বসাককে অজিত ছেড়ে দেবে না, শেষ পর্যন্ত দেখে নেবে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর মুরারির সাথে আরেকদিন দেখা করেছিল অজিত, লেবার কমিশনের আইনের নজির দেখিয়ে বলেছিল,—

'টাকাটা আপোসে দিয়ে দিলেই পারতেন। দিতে যখন হবেই, দেরি করে লাভ কি, দেরি করলে অঙ্কটা কিছু কমে যাবে তা তো নয়।'

বাঁকা হেসে মুরারি বলেছিল, 'সে তো ঠিকই, কিন্তু তার আগে দিতেই হবে কিনা সেটাও ভালো করে জানা দরকার।'

অজিত আর কথা বাড়ায় নি। সেই দিনই ফিরে এসে লেবার কমিশনে লম্বা পিটিশন ছেড়েছে। গ্রাচুইটির টাকা না দিয়ে মুরারি বসাক কেন তার বাবাও রেহাই পাবে না এটা অজিত ঠিকই জানে। অবশ্য লেবার অফিসে ছুটাছুটি হয়তো কিছুদিন করতে হবে। তা আর কী করা যাবে। শুধু টাকা আদায় তো নয়, সেই সঙ্গে মুরারিকে যদি ক্লাইভ বিল্ডিং পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়, সামনে হাজির থেকে অফিসারকে দিয়ে মুরারিকে যদি দুটো ধমক খাওয়ানো যায় তাহলে সেটুকুই বা কম লাভ কি।

সব শুনে শীলা অবশ্য খুশী হতে পারে নি। বলেছে, 'ও টাকা তুমি আর পেয়েছ দাদা, তুমি আইন দেখাবে, ওরা গিয়ে অফিসারকে নোট

দেখাবে। দশ-বিশ টাকা খরচ করলে কোথায় ভেসে যাবে তোমার আইন-আদালত! ওরা সব পারে।'

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে জবাব দিয়েছিল অজিত, 'সব পারে, কিন্তু তাই বলে সবাইর কাছে কি আর সব পারে।'

মনে মনে শীলাও সেদিন ভেবেছিল, তাই যেন হয়। অজিতের কাছে যেন হেরে যায় মুরারি। চাকরি-চলে-যাওয়া সংসারে ছ-সাত শ টাকা কিছুই নয়, তবু তো কিছুদিন দম নেওয়া যাবে। কিন্তু তা হল না; এই তিন মাস ধরে কেবলই তারিখ পড়ছে, কবে যে পাওয়া যাবে, মোটে পাওয়া যাবেই কিনা তাও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম প্রথম 'কেস'-এর দিনে সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকত, কী হয়, অজিত ফিরে এসে কী বলে শোনার জন্যে। মনোরমা এখনও জিজ্ঞেস করেন, জবাবে মুখ-ঝামটা খান অজিতের। কিন্তু শীলা আর কিছু জানতে যায় না অজিতের কাছে, এ প্রসঙ্গে কোন কথা তুলতে গেলেই অজিতের মুখ কালো হয়ে যায়। হয়তো ভাবে দু মাসের নগদ বিদায় নিয়ে অজিত কেন চুপ করে রইল না, সবাই মিলে ওকে বুঝি সেই অনুযোগই দিতে এসেছে।

অনুযোগ শীলা নিজেকেই কি কম দিচ্ছে। অজিতের চাকরি যাওয়ার পর বড় গলায় ভরসা দিয়েছিল, আমি তো আছি। কিন্তু সে থেকেই বা কী করতে পারল। অথচ তার এই বিদ্যায়, এই বুদ্ধিতে কত মেয়ে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে। সমস্ত সংসারের ভার নিতে না পারুক সাহায্য তো করছে। যে কোন কাজ, যাহোক একটা কিছু যদি জুটে যেত শীলার। গোড়ার দিকে অজিতের অবশ্য ভারি অমত ছিল। দাদার কাছে শীলা যতবার চাকরির কথা বলেছে, অজিত হেসে বলেছে, 'আচ্ছা করিস, বয়স তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আর

এর মধ্যে যদি একটা পছন্দমত ভাল অফিসারের জিম্মা করে দিতে পারি তাহলে তো একেবারে পারমানেণ্ট চাকরি, আমাকে আর কটা মাস সময় দে।'

অজিতও বুঝি আর সময় চায় না। মুখে না বললেও শীলার বুঝতে বাকি থাকে না দাদা কী চায়। অবশ্য তার জন্যে শীলার একটুও ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই দাদার ওপর, বরং শীলার কেবলই মনে হয়, সংসারের যে হাল দাদার হাত থেকে ছুটে গেছে সেই হাল যদি ওর হাতের মুঠোয় এসে পড়ত! এক চাকরি ছাড়া শীলাই বা আর কী করতে পারে! কিন্তু চাকরির জন্য চাই যোগাযোগ। পরিচিত আলাপীদের সংখ্যা এত অল্প যে চাকরির কথা বলতে পারে এমন লোকের নাম আঙুলে গোনা যায়।

তবু যোগাযোগ একদিন ঘটে। নিতান্ত অভাবিত ভাবে মণিকাদির কাছ থেকে এক পোস্টকার্ড এসে হাজির। দু লাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠি। মণিকাদি লিখেছে:

কল্যাণীয়াসু,

চাকরির কথা বলেছিলে, খবর একটা পেয়েছি। ষোল আনা শুভ কিনা বলতে পারছি না। তবু তুমি একবার চলে এসো। তোমাদের দিক থেকে যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে হয়তো আর কোন বাধা হবে না। হোক না হোক তুমি অবশ্য এসো। আর কিছু না হোক দেখাশুনাটা তো হবে। কতদিন তোমাকে দেখি না। ইতি—

মণিকাদি

সত্যি অনেকদিন আর মণিকাদির ওখানে যাওয়া হয় নি। বাংলার টীচার মণিকাদি। ভালোবেসে বিয়ে করলেই যে মানুষ খারাপ হয়ে

যায় না মণিকাদিকে দেখেই প্রথম এ কথা মনে হয়েছিল শীলার। কিন্তু তারপর তাঁদের ওখানে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি, কিন্তু কী এমন চাকরির খবর তিনি পেলেন, যা নেওয়া না-নেওয়া শীলাদের মতের ওপর, রুচির ওপর নির্ভর করে আছে। জামাকাপড় বদলে অজিত যেন কোথায় বেরোচ্ছিল। শীলার হাতে পোস্টকার্ড দেখে বলল, 'কার চিঠি ?'

শীলা বলল, 'মণিকাদির, সেই যে আমাদের বাংলা পড়াতেন, একটা চাকরির কথা লিখেছেন।'

রান্নাঘরে ছেলেমেয়েকে খেতে দিচ্ছিল জ্যোৎস্না। পিঁড়িতে বসেই মাছের জন্য বায়না ধরেছে টাটু। জ্যোৎস্না জানে, একটু পরে আপনা থেকেই ওর নাকি কান্না এক সময় থামবে। রোজই থামে, কিন্তু জ্যোৎস্নার আর অতটা সবুর সইল না। জোর গলায় ধমকে উঠল :

'চুপ কর, ফের একটু শব্দ শুনেছি কি গলা টিপে ধরব। আপদের জ্বালায় কোন একটা কথায় কান দেওয়ার জো নেই।'

জ্যোৎস্নাকে উলটে ধমক দেওয়ার পালা মনোরমার। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্যে চুপ করে রইলেন। শীলা-অজিতের কথাটা তাঁরও তো এখনই শোনা দরকার।

শীলা দু কথায় চিঠিটার সারমর্ম সবাইকে জানিয়ে দিল। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনল চিঠির বক্তব্য।

মনোরমা বললেন, 'লিখেছে যখন চিঠি, দেখে আয় কি ব্যাপারটা !'

শীলার ইচ্ছে হল তখনই যায়। কিন্তু এই দুপুর বেলায় গিয়ে লাভ নেই। মণিকাদি এখন স্কুলে পড়াতে ব্যস্ত। স্কুলে দেখা করেও লাভ নেই। সেখানে কথাবার্তা বলবার সুবিধে কম। তাও পুরোনো

স্কুল হলে একরকম ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে মণিকাদি বেনেপুকুরের স্কুল ছেড়ে মানিকতলার অন্য একটা স্কুলে ঢুকেছেন। মাইনে একই রকম। স্কুলটা বাসার কাছাকাছি—এই যা বাড়তি স্থবিধে।

প্রায় পাঁচটা নাগাদ শীলা মণিকাদির বাসায় এসে উপস্থিত হল। সরু গলির মধ্যে ভাড়াটে বাড়িতে পাশাপাশি দুখানা ঘর। কড়া নাড়তেই ঝি এসে দরজা খুলে দিল। শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'মণিকাদি আছেন।'

ঝি বলল, 'বাথরুমে গেছেন। ভিতরে এসে বস্থন।'

তার পিছনে পিছনে শীলা ঘরের মধ্যে ঢুকল। মণিকাদির এই ঘরখানায় শীলা আরো অনেকবার এসেছে। স্কুলে যখন পড়ত তখন মণিকাদি তাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে যেতেন। বেনেপুকুর থেকে মানিকতলা অনেকদূর। কিন্তু তিনি তবু শীলাকে বাস ভাড়া দিয়ে নিজের বাসায় টেনে নিয়ে আসতেন। কোনদিন টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখতেন। শীলা নম্বর যোগ দিয়ে দিত। কোনদিন বা ঘর-কন্নার ছোট ছোট কাজে শীলাকে ডাকতেন তিনি। বলতেন, 'শীলা একটু চা কর তো।' কোনদিন বা বলতেন 'লক্ষ্মী বোন, তোমার বিনয়দার টেবিলটা একটু গুছিয়ে রাখ না।' বিনয়দার চোখ পড়লে তিনি স্ত্রীকে ঠাট্টা করতেন, 'গুরুদক্ষিণা আদায় করে নিচ্ছ বুঝি? ছাত্রীকে খুব খাটিয়ে নিচ্ছ।' শীলা আপত্তি করে বলত, 'না না এর মধ্যে খাটুনির কী আছে। আমি নিজে থেকেই করছি। ওঁর কাজ করে দিতে আমার খুব ভালো লাগে।'

বিনয়দা বলতেন, 'বেশ কর তাহলে। ভবিষ্যতে তো ঘুঁন্দার করতে হবে। এখন থেকে তার রিহার্সাল চলুক।'

মণিকাদি ধমক দিয়ে বলতেন, 'ছি, ওসব কী হচ্ছে? এইটুকু মেয়ের সঙ্গে ও ধরনের ঠাট্টা-তামাসা আমার ভালো লাগে না।'

বিনয়দা বলতেন, 'আঃ তুমি কি ঘরেও মাষ্টারি করবে? আমার এই ঘরে ও আর তোমার ছাত্রী নয়। আমাদের আলাদা সম্পর্ক।'

একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, 'শীলাকে দেখলে তোমার ছোট বোন মিনুর কথা মনে পড়ে। মুখের আদলে অনেকটা মিল আছে। তাই না।'

মণিকাদির মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ত। তিনি বলতেন, 'থাক থাক, তাদের কথা আর তুলে দরকার নেই। তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ নেই।'

বয়স কম থাকলেও শীলা তখনই বেশ বুঝতে পারত এ-সব মণিকাদির অভিমানের কথা। মুখে অস্বীকার করলে কি হবে—বাপ-মা-ভাই-বোন কাউকেই তিনি ভুলতে পারেন নি। তাদের সকলের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদে। বাবার অমতে ভিন্ন জাতের ছেলেকে বিয়ে করেছেন বলে মণিকাদির সঙ্গে তাঁর বাবা আর কোন সম্পর্ক রাখেন নি। তাঁর ছোট ভাই-বোনদের পর্যন্ত দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করে দিয়েছেন। শীলার ওপর মণিকাদির যে এত টান তা সে শুধু ক্লাসের সেরা ছাত্রী বলেই নয়, তার সঙ্গে মণিকাদির ছোট বোনের চেহারার মিল আছে বলেই একথা সেই স্কুলে থাকতেই শীলা বুঝতে পারত।

এখন আরো বেশি করে পারছে। ছোট ভাইদের ওপর শীলার যদি এত টান না থাকত, নিজের পরিবারের কথা যদি এত বেশি করে না ভাবত শীলা, তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। আচ্ছা সুকুমার আর শীলা যদি এখনি বিয়ে করে আলাদা ভাবে বাসা করে থাকে তাহলে

কেমন হয়! অনেকদিন এ ধরনের ছোট সংসারের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছে শীলা। বিনয়দা আর মণিকাদির মত তাদেরও একটি স্বতন্ত্র ছোট সংসার মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই মনঃপূত হয় নি। সংসার মানেই একটি একান্নবর্তী পরিবারের কথা তার মনে পড়েছে। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ, আত্মীয়-পরিজনে ঘেরা বেশ একটি বড় পরিবার। সেই ভিড়ের মধ্যে তারা নিজেরা নিজেদের কাছ থেকে রোজ হারিয়ে যাবে আর রোজ নিজেদের খুঁজে পাবে। না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসার যেন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। যেন একটা পুরো সংসার নয়, একখানা বড় অভিধানের অতি ছোট সংক্ষিপ্ত পকেট সংস্করণ।

সংসার সম্বন্ধে সুকুমারের ধারণাও তাই। সে-ও তো বাপ-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চায়। কিন্তু নিজের পরিবার সম্বন্ধে সুকুমার যে পরিমাণে সচেতন, শীলাদের পরিবার সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণে উদাসীন। যেহেতু শীলা মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সুকুমারকে ভালোবেসেছে, সেইজন্যে তার যেন আর নিজের ভাই-বোন সম্বন্ধে ভাববার কোন অধিকার নেই। পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে যেন কোন দায়িত্ব নেই শীলার! এমন মনোভাব সুকুমারের কী করে এল তা ভেবে বিস্ময় বোধ করে শীলা।

একটু পরে স্নান সেরে শাড়ি বদলে মণিকা বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে ঢুকল। এ ঘরের লাগা ছোট-মত আর-একখানি ঘর আছে। বন্ধুবান্ধব কেউ এলে সেই ঘরে নিয়ে বসায় তারা। কিন্তু শীলার অধিকার তাদের চেয়ে বেশি। শীলা মণিকার বন্ধু নয়, ছোট বোনের মত। ঠিকে ঝি যশোদা তাই তাকে একেবারে শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

শীলাকে দেখে মণিকা স্মিতমুখে বলল, 'এই যে শীলা। অনেকক্ষণ বসে আছ বুঝি।'

শীলা বলল, 'না খানিক আগে এসেছি। আপনার চিঠি পেয়ে এলাম।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী রকম চাকরি মণিকাদি। সে কথা তো কিছু লেখেন নি।'

মণিকার হাসিমুখ এবার একটু গম্ভীর দেখাল। শীলার কথার জবাবে বলল, 'বস বস, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। এতদিন পরে এলে, ভালোমন্দ কেমন আছি না আছি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নেই। এসেই একেবারে চাকরির খোঁজ। ভারী স্বার্থপর মেয়ে তো তুমি।'

শীলা একটু লজ্জিত হল। তারপর মৃদু-হেসে বলল, 'জিজ্ঞেস আর কী করতে যাব। আপনি তো ভালোই আছেন দেখতে পাচ্ছি। আপনার চেহারা আগের চেয়ে সত্যিই অনেক ভালো হয়েছে মণিকাদি। এবার বোধ হয় আপনাকে স্কুল থেকে ছুটি নিতে হবে।'

এবার মণিকার লজ্জিত হওয়ার পালা। এই প্রথম সন্তান হবে তার। পাঁচমাস চলছে। তার চেহারার দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে 'ক্লীগ'দের ঠাট্টা-তামাসা প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু পুরনো ছাত্রীর মুখে কথাটা শুনে মণিকা নতুন করে লজ্জা পেল। শীলার দিকে তাকিয়ে ধমকের ভঙ্গীতে বলল, 'ফাজিল মেয়ে, সে কথা শুনে তোমার কি দরকার।'

শীলা মুখ নীচু করে হাসল।

একটু বাদে বলল, 'কই, আমার কথার জবাব দিলেন না তো। কী ধরনের চাকরি, কত মাইনে।'

মণিকা একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার বিনয়দা অফিস থেকে

আসুন। তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবে। তিনি সব ঠিকঠাক করেছেন।'

শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কখন আসবেন!'

মণিকা বলল, 'অন্যদিন তো এতক্ষণ চলে আসেন। বস, ছটার মধ্যেই এসে পড়বেন।'

কয়েকটা দিন বড় অস্বস্তির মধ্যে কাটল সুকুমারের। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, অফিসের কাজে মন বসছে না। কলকাতার অফিসে স্টাফ বেশি, কাজ অল্প। কিন্তু সেই সামান্য কাজটুকু সারতেই যেন মন হাঁফিয়ে ওঠে, পালাই পালাই করে। বাড়িতে এসেও সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। মনে হয় এর চেয়ে অফিস ছিল ভালো। রাণী-বাণী ডাকতে এসে ধমক খেয়ে ফিরে যায়। মেজাজ দেখে বিমলপ্রভা ছেলেকে এড়িয়ে চলেন। এমন শূন্যতা সুকুমার আর কোনদিন বোধ করে নি। অবশ্য সুকুমার জানে এ শূন্যতার উৎস কোথায়। সেদিনের শীলার একটা কথা যেন কানে বিঁধে রয়েছে। শীলা বলেছিল প্রয়োজন হয়েছিল বলেই যেখানে খুশি চাকরি নিয়েছে। সব ব্যাপারেই যে ওর ইচ্ছা, ওর ব্যবস্থা শীলাকে মেনে নিতে হবে তার কি মানে আছে। শেষ পর্যন্ত সুকুমার যখন শেষ অস্ত্র হেনে বলেছে, 'এ চাকরি না ছাড়লে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও এই শেষ;' তখনও শীলা নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ গলায় শুধু বলেছে, 'ভেবে দেখি।' সুকুমার জানে শীলা নতুন করে আর কিছু ভেবে দেখবে না। আগে থেকেই ওর সব ভাবা আছে। সুকুমারের মুখের একটা কথায়, ওর একটু আকুলি-বিকুলিতে চাকরি ছেড়ে দেবে সে মেয়ে নয় শীলা, বয়সের

অনুপাতে শীলা যেন বড় বেশি হিসাবী। বড় বেশি বুদ্ধিমতী। ওদের বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মূলেও তো শীলার এই হিসেব বোধ। ও কি ইচ্ছা করলেই সেদিন এই পারিবারিক বাধা-বিপর্যয়কে ভাসিয়ে দিতে পারত না। সুকুমার তো ভেসে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। শীলা কেন সব ভাসিয়ে দিল না। কিন্তু সে জোয়ার কোথায় শীলার মধ্যে। ওর ক্ষীণ দেহের মতই শীলা বড় ক্ষীণস্রোতা। তবু সেই ক্ষীণাঙ্গীকে ভোলা যায় কই? কিছুদিন আগের যে মেয়ে এ বাড়িতে নিয়মিত আসত, বসত, কথা বলত তার অভাবে সমস্ত বাড়িটারই যেন রং বদলে গেছে। এ অভাব শুধু সুকুমারের কেন, বাণী-রাণী বিমলপ্রভা সবারই চোখে পড়েছে। সুকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বিমলপ্রভা তা টের পান, বিমলপ্রভার মুখোমুখি হয়ে সুকুমারের তা বুঝতে বাকি থাকে না।

অফিসে বেরোবার পথে বিমলপ্রভা এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মেয়েটার একটা খোঁজ নিলেও তো পারিস?'

সুকুমার হেসে বলল, 'খোঁজ কি একেবারেই নেই-না বলে তোমার মনে হয়।'

বিমলপ্রভাও হাসলেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তাতে সুকুমার যে কিছু লুকোবে না তা তিনি জানেন।

'তা না হয় নিলি। কিন্তু সে তো একতরফা। শীলাও তো একদিন আসতে পারে।'

'না, বোধ হয় পারে না। নতুন চাকরি পেয়েছে। সময় কই তার?'

বিমলপ্রভা হেসে বললেন, 'নতুন চাকরিই না হয় পেয়েছে, নতুন মানুষ তো আর পায় নি।'

পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে সুকুমার বলল, 'পেয়েছে কিনা

তারই বা ঠিক কি ? অফিসে সবাই তো নতুন মুখ। আর সবগুলিই যে তোমার ছেলের মুখের তুলনায় কুচ্ছিৎ তাও নয়।'

যাক, বিমলপ্রভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, সুকুমার তাহলে শীলার অফিসে রোজ যাওয়া-আসা করে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। সেদিনের পর সুকুমার আর শীলাদের অফিসমুখো হয় নি। কী দরকার, সে যদি নিজে থেকে খোঁজ-খবর না নেয় সুকুমারেরই বা কি এমন দায় পড়েছে। শীলা যদি না দেখা দিয়ে থাকতে পারে সেই বা না দেখে থাকতে পারবে না কেন ? কিন্তু সত্যিই কি তা পারা যায় ? যায় না। ও কেবল রাগের কথা, অভিমানের কথা। না হলে মাঝখানে মোটে তো সাতটা দিন কেটেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সাতমাস ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আজকের এই অফিসে যাওয়ার তোড়জোড় আসলে নিজের অফিসে নয় আজ সোজা গিয়ে শীলার অফিসেই উঠবে সুকুমার। তারপর চুরি-করা একটি দিন, ফাঁকি-দেওয়া একটি দিন, যেখানে খুশি যেভাবে খুশি শীলাকে সঙ্গে নিয়ে কাটাবে। অসময়ে হঠাৎ দেখে শীলা অবাক হয়ে যাবে। ওর কথা শুনে হেসে বলবে হয়তো, 'কি পাগলামি বল তো।' সুকুমার বলবে, 'হ্যাঁ পাগলামিই। একটা দিনের জন্য সত্যি একটু পাগলামি করব ! না কোরো না।' তারপর মিথ্যা অজুহাতে ওকে অফিস থেকে বাইরে নিয়ে আসবে।

কিন্তু শীলার অফিসে ঢুকে সুকুমার দেখল শীলা নেই। জর হয়েছে বলে দুদিন থেকে ছুটি নিয়েছে।

জরের খবরটা অবশ্য পেল আরতির কাছ থেকেই। আরতি বলল, 'প্রথমদিন জর নিয়েই অফিস করেছে। কি জেদী মেয়ে বাবা। জর হয়েছে, ম্যানেজারকে বলে চলে গেলেই হয়। তা নয় সেই পাঁচটা অবধি দপ্তর আগলে বসে থাকবে। শেষ পর্যন্ত একরকম ঠেলে বাড়ি

পাঠিয়েছি। জরটা বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে, নইলে সহজে অফিস কামাই করবে—শীলা সে মেয়ে নয়।' রাস্তা পর্যন্ত সাথে সাথে এল আরতি, তারপর গলা নীচু করে বলল—

'এখন কী করবেন? অফিসে ঢুকলেই তো সেই সাত ঘণ্টার ধাক্কা। আর অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসলেই কি কাজ করতে পারবেন ভাবছেন? রোগীর কাতরানি কানে আসবে। তার চেয়ে আমি বলি, আজকের অফিস বরং আরেক জায়গায় হোক; ওপরওয়ালা যেখানে চোখ পাকিয়ে বসে নেই, চোখ বুজে ধ্যান করছে, তার ওখানে।' মধুর শব্দ তুলে আরতি হেসে উঠল।

সঙ্কোচের বালাই নেই আরতির। অথচ ওর হাসির শব্দে সুকুমার আড়ষ্ট হয়ে উঠল, অফিসের আর-তিনটি লোক কী জানি কী ভাবছে।

সুকুমার বলল, 'আজ নয়, কাল-টাল বরং খোজ নেয়া যাবে, তা ছাড়া ওদের বাড়ি কোনদিন আমি যাই নি। আর বাড়ির নম্বরটাও ঠিক মনে পড়েছ না।'

মৃদু হেসে আরতি বলল, 'মাপ করবেন, দুটোর একটাও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। সব জানা-জানির পালা শেষ হয়েছে অথচ বাড়ি যান নি, বাড়ির নম্বরটা মুখস্থ করেন নি, এটা বিশ্বাস করা একটু শক্ত বইকি। অবশ্য ঠিকানা আমি আপনাকে দিতে পারি, শুধু ঠিকানা কেন, বলেন তো সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারি। বেনেপুকুর খুব একটা দূরের রাস্তা নয়। তাছাড়া কলিগের অসুখ—তাকে দেখে আসা আমারও তো কর্তব্য। বলেন তো আমিও সঙ্গে যাই।

সুকুমার বলল, 'কিন্তু আপনারও তো এখন অফিস।'

‘হলই বা। আপনার বা শীলার মত অফিসকে আমি অত ভালোবাসি না, সুকুমারবাবু।’

সুকুমার হেসে বলল, ‘আপনি ভালো না বাসতে পারেন, তাই বলে এরা আপনাকে এই মুহূর্তে ছুটি দেবে কেন।’

আরতি বলল, ‘চল্লিশ টাকার পোশাকী টাইপিস্টের ওপর ছুটিছাটার কড়াকড়ি করবে—এরা কি অত বোকা ভেবেছেন?’

ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল আরতি। এগারটার অফিস অঞ্চল। অফিসে যারা ঢুকবার তারা অনেকক্ষণ ঢুকে গেছে আর বেরোতে সেই পাঁচটা। অফিসে অফিসে কর্মতৎপরতা, বাইরে ঠিক সেই পরিমাণে নিষ্ক্রিয়তা, কেমন একটা ঝিমোনো ভাব। ট্রাম-বাসগুলো কিছুটা ফাঁকা হয়েছে এতক্ষণে, মাথার ওপর চড়া রোদ—ঘরের মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাপটা যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। আরতিকে নিয়ে সোজা গিয়ে কি ট্রামে উঠবে সুকুমার? থমকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত সুকুমার কী যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, ‘চলুন একটু সরবত খাওয়া যাক।’

আরতি বলল, ‘আপত্তি করব না। কারণ সেদিনের চা আমার পাওনা আছে। তার বদলে এক গ্লাস সরবত দিলে, আপনি নতুন কিছু দিলেন না। পুরনো পাওনাই শোধ দিলেন।’

রেস্টুরেন্টে ঢুকতে ঢুকতে সুকুমারের বুঝতে বাকি রইল না এ দেনা-পাওনা কেবল চা-সরবতেরই নয়। আরতির কথার মধ্যে আরও কিসের যেন একটা ইঙ্গিত আছে। বয়কে ইসারায় পাখা খুলে দিতে বলে দুজনে বসল মুখোমুখি। সুকুমার চোখ তুলে দেখল। প্রথম দিনের বিরূপ দৃষ্টিতে আরতিকে দেখতে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল আজ দেখল ততটা খারাপ ও নয়। শীলার চেয়ে একটু হয়তো মোটা,

কিন্তু গড়নের সঙ্গে সে স্থূলতা আশ্চর্য রকম মানিয়ে গেছে। পোশাক আর প্রসাধনের ব্যাপারে একটু যেন বেশী মনোযোগী। তা হলই বা, সেই মনোযোগ যে আরেকটি মনকে ধরার জন্যেই একথা ভাবতে কি খারাপ লাগে ?

একটু আগে বয় এসে অর্ডার-মাফিক দুজনের সামনে দু গ্লাস রঙিন সরবত রেখে গেছে, নল লাগিয়ে সামান্য একটু চুমুক দিয়ে আরতি বলল, 'কই খাচ্ছেন না তো। কী ভাবছেন ?' তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আসলে ভাবছেন না কিছুই ; শুধু দেখছেন আর মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছেন। না সে ভয় নেই। রূপের দিক থেকে আপনার বান্ধবীর ধারেকাছেও যেতে পারব না। রঙের দিক থেকেও তো দু-তিন ডিগ্রি হেরে বসে আছি।' বলে বাঁ হাতখানা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল আরতি। অনামিকায় নকল-পাথর-বসানো একটা সোনার আংটি। রং নয়, আংটিটা দেখার জন্যেই যেন সুকুমার আলগোছে ওর আঙুলে হাত দিল, বলল, 'আপনার আংটিটা কিন্তু সত্যি মানিয়েছে।'

সেদিন আর শীলাদের বাসায় সুকুমারের যাওয়া হল না। আরতি অবশ্য অনেক বার বলেছিল। কিন্তু সুকুমার রাজি হয় নি, জ্বরই তো। সুবিধামত একদিন খবর নিলেই চলবে। তাছাড়া গোড়াতে যাই মনে হোক আরতিকে সঙ্গে করে শীলাদের বাড়ি যেতে সুকুমারের পা সরে নি, কেবলই বাধ-বাধ ঠেকেছে। কিন্তু সুকুমারের এই সঙ্কোচ কেন ? আরতিকে সঙ্গে দেখলেই কি শীলা কিছু মনে করত ? তা করত না। শীলার মনের খবর তো সুকুমারের অজানা নেই। ওর ক্ষীণ দেহের নির্মোকে এক আশ্চর্য কঠিন মনের অধিকারিণী শীলা। হঠাৎ তাতে আঁচড় লাগে না, দাগ পড়ে না। ওর এই সংযম, দৃঢ় ব্যক্তিত্বকে সুকুমার শ্রদ্ধার চোখে না দেখে পারে নি। এবং একথাও ঠিক ওর এই দৃঢ়তাই সুকুমারকে

সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আরতির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সুকুমারের মনে হয়েছে মেয়েদের আরেকটা দিকও আছে। ওদের চাঞ্চল্য চপলতা—সেটাও উপেক্ষা করার নয়। চেহারার মত শীলা আর আরতির মানসিক গঠনেরও একটা তুলনামূলক বিচারও যে সুকুমারের মনে উঠেছে সেকথা সুকুমার অস্বীকার করবে কি করে ?

বাড়ি ফিরে সুকুমার নিজে থেকেই বিমলপ্রভাকে খবরটা বলল, 'শীলা জ্বরে পড়েছে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'জ্বরের আর দোষ কি ? ঐ তো শরীর, তার ওপরে অফিসের খাটুনি।'

সুকুমার হেসে বলল, 'না এমন কিছু খাটুনির কাজ নয়।'

শীলা অফিসে চাকরি নিয়েছে, সুকুমারের কাছ থেকে বিমলপ্রভা এইটুকুই শুধু জানতেন। কি কাজ, কিসের কাজ কিছুই জানা হয় নি। সব শুনে বললেন, 'তুই কেন মত দিলি ? চাকরি করার দরকার পড়েছে বলেই কি যেখানে সেখানে যা-তা একটা অফিসে কাজ নিতে হবে।'

সুকুমার ম্লান হেসে বলল, 'আমার মতামতের জন্য সে বসে থাকবে একথাই বা তোমাকে কে বলল।'

বিরক্ত হয়ে বিমলপ্রভা বললেন, 'না থাকবে না, আসলে তোরও সায় আছে এ চাকরিতে।'

সুকুমার বলল, 'তুমি মিছিমিছি ভয় করছ মা, শীলার মত মেয়ে যে অফিসেই কাজ করুক, কিছু আসে যায় না, তাছাড়া চাকরি যাদের করতে হবে তাদের অত অফিস বাছাবাছি করলে চলবে কেন ?'

বিমলপ্রভা খুশী হয়ে বললেন, 'তা ঠিক, ওকে আমি যেখানে খুশি ছেড়ে দিতে পারি।' তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু তোর তো কাজ বাড়ল।

এতদিন অফিস যাওয়া-আসার পথে পড়ত। এবার তো বেনেপুকুর পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে। কালই গিয়ে খবর নিয়ে আয়।’

সুকুমার বলল, ‘দেখি।’

রোগশয্যায় শুয়ে একদিনে দু-খানা চিঠি পেল শীলা। একখানা সুকুমারের আর একখানা আরতি লিখেছে। সুকুমার লিখেছে অফিসে গিয়ে খবর শুনে সুকুমারেরা উদ্বিগ্ন রয়েছে, কেমন আছে লিখে জানাতে বলেছে। সুকুমারের উদ্বেগ যেন ডাক্তারী উদ্বেগ। ওজন করে করে লেখা কেবল কয়েকটি কাজের কথা। তার বেশী কিছু নয়। শীলার প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি সুকুমারের অভিমান। সেদিন ওকে চটিয়ে দিয়েছিল, সুকুমার বুঝি তার শোধ তুলছে। কিন্তু দু-তিন বার ধরে পড়ার পর শীলার মনে হয়েছে আর যাই থাক এ চিঠিতে রাগের উত্তাপ নেই। নেহাতই যেন ভদ্রতার খাতিরে লেখা। আরতির চিঠির ভাব আলাদা, ভাষা আলাদা, অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। যে মেয়ের মুখের আগল নেই সে যে কলমে আরেক ডিগ্রী বাড়াবাড়ি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ওর চিঠি পড়তে পড়তে একা থাকলেও শীলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সাবুর বাটি নিয়ে জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে বলল, ‘আজ বুঝি চিঠিতেই পেট ভরবে। সাবু-বালির আর দরকার নেই?’

শীলা হেসে বলল, ‘তা ভরাতে পারলে মন্দ হত না। যা সুখাদ্য গেলাচ্ছ কদিন ধরে।’

জ্যোৎস্না বলল, ‘কী করবে ভাই, তোমার গরিব বৌদির সাধ্য তো জান, এর বেশী কিছু জোটাতে পারলে তো।’

শীলা বলল, ‘তা বলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তুমি শুধু সাবু গেলাবে নাকি?

অবশ্য জ্যোৎস্না এবারে শুধু সাবু আনে নি। সাবুর সাথে কিছুটা

দুধ মিশিয়ে এনেছে। ছেলেমেয়েদের রোজের দুধ এ-বাড়িতে অনেকদিন বন্ধ হয়েছে, অজিতের চাকরি যাওয়ার পর থেকেই। আজ জ্যোৎস্না নিজে কর্তৃত্ব করে এক পো দুধ কিনেছে। শীলা শুধু সাবু-বার্লি কোনদিনই খেতে পারে না।

সাবুর বাটিতে একটু চুমুক দিয়ে মুখ তুলতেই শীলার চোখে পড়ল আধ-শুকনো একটা লেবু তাকের ওপর। অজিত রেখে গেছে। বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে ওটা অজিতে বাড়তি সওদা। শীলা এবার বুঝতে পারল দাদার ছেলেমেয়ে দুটি কেন এসে ওখানটায় এতক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। শীলা ভাবল দাদা বৌদির হঠাৎ যে একটু বেশী দরদ এটা কেন? শীলা আজ চাকরি করছে, যে ক-টাকাই হোক সংসারে দিতে পারছে, আরো বেশী দেবে সেই ভরসা দিতে পারছে, এ সৌজন্য কি কেবল সেই বিবেচনায়। কিন্তু এ জিনিসটার এসব কদর্থ করতে শীলার মন সরে না। সংসারের অবস্থা আরেকটু সচ্ছল হলে এই সাধারণ সুখদুঃখসর্বস্ব মানুষগুলিও কেমন উদার স্নেহময় হয়ে উঠতে পারে সে কথা ভেবে শীলা খুশী হয়ে উঠল। না, সে চাকরিই করবে মন দিয়ে, খোঁজ করবে এর চেয়ে বড় চাকরির, বেশী মাইনের চাকরির। সাবুর বাটি শেষ করে শীলা সোজা হয়ে বসল।

জ্বর অবশ্য কয়েকদিন বাদেই ছেড়ে গেল। কিন্তু দুর্বলতা সহজে যেতে চায় না। দাদা, বৌদি, মা সবাই বারণ করলেন। থাক আরো দু-একদিন। শীলা সে কথায় কান দিল না। দশটা বাজার আগেই খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা মেটাল, কাপড় বদলাল তারপর এসে রাস্তায় নামল। পিছনে পিছনে জ্যোৎস্না এল কিছুটা পর্যন্ত, গলা নামিয়ে বলল, 'সত্যি বল তো ভাই টানটা আসলে কিসের অফিসের না আর কিছুর?'

মুখ ফিরিয়ে শীলা একটু হাসল, 'এসে বলব।'

অফিসে ঢুকল শীলা ভয়ে ভয়ে; অবশ্য ভয়টা যে অমূলক সেটা নিজেও বুঝল। ও তো আর ইচ্ছে করে অফিস কামাই করে নি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর অসুখের ওপর কোন কথা চলতে পারে না। এই নিয়ে কৈফিয়ত তলব করবে, সুধাংশু সে প্রকৃতির মনিব নয়। তবু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। দু-সপ্তাহ কাজ করতে না করতেই দশ-বার দিন কামাই। এই কদিনেই কিছু কিছু কাজ সম্বন্ধে সুধাংশু ওর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। শীলা না থাকায় সেটুকু আবার সুধাংশুর নিজেরই করতে হয়েছে। অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়ই। আরতির ভ্যানিটি ব্যাগ দেখে বোঝা গেল সেও যথাসময়ে এসেছে। কিন্তু আরতি 'সিটে' নেই। সকালেই কোথায় বেরিয়েছে কে জানে?

শচীনবাবুকে শীলা জিজ্ঞেস করল, 'আরতি কোথায়?'

বিরক্ত হয়ে শচীনবাবু জবাব দিলেন, 'কী জানি। এসেই তো কোথায় বেরিয়ে গেলেন। তিনি তো আর অফিস করতে আসেন না, আসেন কেবল—'

শচীনবাবু হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার দপ্তর কিন্তু ফেব ম্যানেজারের ঘরে চলে গেছে।'

শীলা হেসে বলল, 'তাই তো দেখছি।'

একটু পরে সুধাংশুর চাপরাশি এসে শীলাকে ডেকে নিয়ে গেল।

না, শীলা এতক্ষণ মিছামিছি ভয় করছিল, ভাবনায় পড়েছিল। সুধাংশু মোটেই অপ্রসন্ন নয়, ওর মুখে বিরক্তির সামান্যতম ভ্রুকুঞ্চনও শীলার চোখে পড়ল না। সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সুধাংশু বলল, 'বসুন, কেমন আছেন?' তারপর একটু থেমে বলল, 'অবশ্য এ প্রশ্ন অবান্তর। ভালো যে নেই সেটা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

এত তাড়াহুড়া করে আসবার কী দরকার ছিল। কয়েকটা দিন রেস্ট নিলেই তো পারতেন।'

শীলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'আপনার অসুবিধা হচ্ছিল।'

'সেটা তেমন কিছু না।' সুধাংশু বলল, 'আসলে আমাদের ওপর আপনাদের আস্থা কম। ভাবেন কনট্রাক্ট করা, টাকা-পয়সার লেনদেন করা, আমরা কেবল এইসব বড় বড় কাজ নিয়েই আছি। খুঁটিনাটি রুটিন্ ওয়ার্ক আমাদের দ্বারা হবার নয়। দুটো ঠিকমত করব তো তিনটা ভুল করে বসে থাকব। তা কিন্তু নয়। এই তো, এ কদিন আপনার রেজিস্টারগুলো আমিই মেনটেন করেছি, দেখুন তো একটা ভুল বার করতে পারেন কিনা। যা ভাবেন তা নয়।'

শীলা আস্তে আস্তে বলল, 'না না, তা ভাবব কেন!'

সত্যি সুধাংশু সম্বন্ধে তা ভাবা যায় না। আসলে অফিস যেন একা সুধাংশুরই। কাগজপত্রে শীলা দেখেছে আরও পার্টনার আছে, আছে লাভের ভাগীদার। কিন্তু তারা আছে নেপথ্যে। সুধাংশুই সব। কে জানে কিসের প্রেরণায় সুধাংশু প্রাণ দিয়ে বুক দিয়ে অফিস আগলে চলে। সেটা কি শুধু অর্থের মোহ। মনে তো হয় না।

অফিসে এই প্রথম ঢুকলেও অফিসের মালিকদের সম্বন্ধে শীলা অনেক রকম কথা শুনেছে, অনেক জেনেছে। কিন্তু সে জানাশোনার সঙ্গে সুধাংশুর এতটুকু মিল নেই। একেবারে ভিন্ন মানুষ সুধাংশু। ওর সম্বন্ধে একেক সময় ভারি কৌতূহল বোধ করে শীলা। মানুষটাকে যদি আরেকটু কাছে থেকে জানা যেত। কোথায় বাড়ি, কেমন বাড়ি। বাড়িতে আর কে কে আছে এই সব।

আগের কথার জের টেনে সুধাংশু বলল, 'অফিস সম্বন্ধে আপনি যে

এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ultimately ওতে কিন্তু অফিসের লাভ নয়, লোকসান।'

'কি রকম?'

'God forbid, দুদিন কাজ করে ফের যদি অসুখ বেড়ে যায়? তাহলে তো আবার ছুটি নিতে হবে। যা delicate health আপনার' সুধাংশু চোখ খুলে তাকাল শীলার দিকে।

আড়ষ্ট হয়ে মুখ নীচু করে শীলা বলল, 'তাহলে তো অসুখ সারার পরও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হয়।'

'তা তো হয়ই! বিশেষ করে কোম্পানি যার ওপর নতুন কাজ চাপানোর কথা ভাবে।' সুধাংশু হাসতে থাকে।

'আর কী কাজ দেবেন।'

'টাইপরাইটারটাও আপনার টেবিলে চালান করব ভাবছি।'

শীলা তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু আমি তো টাইপ জানি না।'

'জানেন না, শিখবেন। কাজ চালানোর মত শিখে নিতে আপনার এক মাসের বেশী সময় লাগবে না। ততদিন নিজেই চালিয়ে নেব।'

'কিন্তু মিস মল্লিক তো রয়েছেন।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'না তিনি নেই। এসে অবধি বেরিয়েছেন, কদিন থেকে তাঁর এক নতুন বন্ধু প্রায়ই আসছেন। হয়তো তিনিই অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করছেন। মিস্ মল্লিকের এখানে আর ভালো লাগছে না এটা বুঝতে পারছি।'

'নতুন বন্ধু।' শীলার মনের মধ্যে খচ করে উঠল, 'সুকুমার নাকি?'

সুধাংশুর ঘর থেকে বেরিয়েই আরতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল শীলার। এইমাত্র অফিসে ঢুকেছে।

আরতি বলল, 'আর একদিনও বুঝি তর সইল না। অফিস বুঝি

পালিয়ে যাচ্ছিল।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আসলে অফিস তো নয়, একজনকে না দেখে থাকতে পারছিলে না।' সে কোন্‌জন ? শীলা আশঙ্কা করছিল আরতি স্থকুমারের কথা তুলে হয়তো আরও দু-একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলবে। কিন্তু স্থকুমারের নাম করল না আরতি। শীলার বুঝতে বাকি রইল না আরতি কার ইঙ্গিত করছে। তবে কি স্থকুমার ওর খোঁজ নিতে আর একদিনও আসে নি। বিশ্বাস হয় না। অস্থখের মধ্যে পাওয়া ওদের দুজনের চিঠি দুটোর কথা শীলার মনে পড়ল। স্থকুমার এসেছে ঠিকই। হয়তো কয়েকদিনই এসেছে। আরতির নতুন বন্ধু বলে।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'এসেই কোথায় বেরিয়েছিলেন ?'

আরতি বলল, 'কেন, ম্যানেজার খোঁজ করেছিল নাকি ?' তারপর একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'খোঁজ যে আর করবে না, সেটা জানি। কৈফিয়ত তলব করছিল বল।'

'সেটা কি অন্যায় ?'

আরতি বলল, 'ও, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভারটা বুঝি আজ থেকে তোমার ওপর পড়ল ? পড়বেই বা না কেন ? সারা সকালটা চেম্বারে আটকে রেখে একেবারে শুধু হাতে ছেড়ে দেবে ম্যানেজার ততটা অভদ্র নয়। কিন্তু নীতিকথা আমার কানে ঢুকিয়ে কি স্থবিধা হবে ?'

কথাগুলি আরতি হেসে হেসে বললেও শীলা বুঝতে পারল এ শুধু ঠাট্টা নয়, আরতির কথায় ঝাঁজ আছে, জ্বালা আছে। শীলা চুপ করে রইল। এতদিন পরে আজ প্রথম অফিসে এসেছে, কোথায় আরতি দুটো ভালো কথা বলবে, স্থকুমারের কথা তুলে ঠাট্টা-তামাসা করে অফিসের আবহাওয়াটাকে লঘু করে তুলবে, তা নয় সকাল থেকেই কি রকম বাঁকা বাঁকা কথা বলে মনটাকে তিক্ত করে তুলছে। অবশ্য

আরতির স্বভাবই অমনি। হঠাৎ রেগে যায়। শীলাকে চটিয়ে দেয়। কিন্তু এবেলার রাগ ওবেলা থাকে না। আবার নিজে যেচে এসে এক সময় সন্ধি করে। কিন্তু আজ তা হল না। বিকেল পর্যন্ত শীলার সঙ্গে একটা কথাও আর বলল না আরতি। মাথা নীচু করে একটানা টাইপ করে গেল। তারপর হাতের কাজ শেষ হলে মাথাধরার অছিলায় সুধাংশুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে শীলার সামনে দিয়ে একসময় গটমট করে বেরিয়ে গেল।

যাওয়ার জায়গার আরতির অভাব কি? এই এসপ্লানেডেই, অফিস অঞ্চলে পরিচিত আলাপিতের সংখ্যা কম নেই। এখনও সব অফিস ছুটি হয় নি। সুব্রত পরিতোষ ওদের যে-কোন একজনকে গিয়েই এখন ধরা যায়। আর কিছু না হোক একটা টোস্ট এক কাপ চা ওদের ঘাড় ভেঙে খেতে বাধা নেই। বাড়তি পয়সা ছিল না বলে আজ টিফিন পর্যন্ত করতে পারে নি। কিন্তু পেটে ক্ষিদে থাকলেও আজ আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না কারো কাছে যেতে। অফিসে এসেই যে আরতিকে এই রোদের মধ্যে বেরোতে হয়েছিল সে কি সাধ করে? দুশো একশ নয়, মাত্র দশটা টাকা একজনের কাছে ধার চাইতে গিয়ে বেকুব বনতে হয়েছে। অথচ দশটা টাকা প্রশান্তর কাছে কী! ইচ্ছে করলেই দিতে পারত। প্রশান্তর অভিমানের কারণটি কি জানতে বাকি আছে আরতির? সুকুমারের সঙ্গে একদিন ওকে যেতে দেখেছে বলেই প্রশান্তর এই হিংসা। আশ্চর্য, মেয়েদের মন মন করে ওরা মরে অথচ নিজেদের কথাটা একবার ভেবে দেখে না। নিজেদের স্বার্থের বেলায় ওরা সব সমান, সবাই সমান।

একটানা অতক্ষণ টাইপ করে আঙুলগুলি এখন ব্যথায় টনটন করছে আরতির। শরীরে কেমন একটা ক্লান্ত অবসন্ন ভাব। রোদ্দ

পড়ে গেছে। এতক্ষণে ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে একটু। মনে মনে আরতি বলল, আঃ! তারপর হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে ভাবতে কখন এসে স্বকুমারের অফিসের সিড়িতে পা দিল নিজেই টের পেল না। স্বকুমার বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এখানে?'

আরতি হেসে বলল, 'একটা খবর দিতে এলাম। স্বখবর। শীলা আজ জয়েন করেছে। ছুটির পরে দুজনে একসঙ্গে ফিরতে পারবেন। কিন্তু তার আগে পাওনাটা শোধ করুন। চলুন চা খাওয়াবেন। ভেবে দেখলাম পাওনা বেশীদিন ফেলে রাখা ঠিক নয়।'

স্বকুমার হেসে বলল, 'কিন্ত পাওনাদার তাগিদ দিলেই কি সব সময় দেনা আদায় হয়?'

ম্লান হেসে আরতি বলল, 'আজ হবে। আজ দেনাদারের মেজাজ ভালো আছে।'

চা খেতে খেতে আরতি বলল, 'আর কোথাও দিন না একটা চাকরি-বাকরি ঠিক করে। এখানে আর ভালো লাগছে না। তা ছাড়া ওদেরও বোধ হয় খারাপ লাগতে শুরু করেছে।'

স্বকুমার বলল, 'কেন?'

আরতি বলল, 'আসলে দুজনকে পুষবার ওদের মুরোদ কোথায়? একজনকে রাখলেই যখন কাজ চলে যায় তখন একজনকেই রাখবে। শীলার সঙ্গে আমি competitionএ পারব কেন? আর সে competition আমি করতেও যাব না।'

স্বকুমার বলল, 'এ আপনার ভুল ধারণা। ওর কাজ আর আপনার কাজ তো আলাদা।'

আরতি হেসে বলল, 'ওদের আপনি জানেন না। দুজনেরটা একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কতক্ষণ?'

চায়ের কাপ শেষ করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সুকুমার বলল, 'কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।'

'কী ?'

'আপনারও কি চাকরি না করে চলে না ? মানে সংসারের দিক থেকে অসুবিধে হয় ?'

আরতি একটুকাল চুপ করে রইল তারপর বলল, 'না দাদারা চাকরি করে, বাবাও একেবারে বসে নেই। সংসার এক রকম চলে যায়। কিন্তু আমার চলে না। একখানা শাড়ির জন্য, এক পিস্ ব্লাউজের কাপড়ের জন্য দাদাদের কাছে হাত পাতব আর কথা শুনব সেটা আমার বরদাস্ত হয় না।'

সুকুমার বলল, 'কিন্তু দরকার পড়লে দেবেন না সেই বা কেমন কথা ?'

আরতি আবার একটু হাসল বলল, 'আপনি তো ওদের দেখেননি। বাড়িতে যেন হিসাবের সরকারী অফিস বসিয়েছে। একটি পাই-ফার্দিং এদিক ওদিক হবার জো নেই। সংসারের সব খরচ একবারে নিক্তির ওজনে বাঁধা। অত আঁটা-আঁটির মধ্যে মন আমার পালাই পালাই করে।'

সুকুমার ফস করে বলে উঠল, 'পালালেই পারেন।'

সুকুমারের চোখে চোখ রেখে আরতি বলল, 'পালিয়ে যাওয়ারও তো জায়গা চাই। কিন্তু আপনাকে আর আটকে রাখব না। এর পরে গেলে হয়তো শীলার সঙ্গে দেখা হবে না।'

সুকুমার বলল, 'না, ওর সঙ্গে বাড়িতে গিয়েই দেখা করব। চলুন বরং আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দিই।'

আরতি অবশ্য বারণ করেছিল কিন্তু সুকুমার ওর কথায় কান দিল

না। ইঙ্গিতে একটা রিকশা ডেকে তাতে দুজনে উঠে বসল। সুকুমারের মনে হল, আরতির কথাই ঠিক। কেবল হিসাব মেনে চললে, হিসাব করে চললে জীবনে বড় বঞ্চিত হতে হয়। হিসাব সবার জন্যে নয়। মনকে আঁখি ঠেরে লাভ নেই, আরতিকে পাশে বসিয়ে চলার মধ্যে এই যে খুশিতে সুকুমারের মন ভরে উঠেছে সে কথা স্বীকার করতে ভয় কি ?

সুকুমারের গায়ে গা মিশিয়ে মধুর হেসে আরতি বলল, 'পাওনা আদায় করতে গিয়ে এ আবার কোন্ দেনায় আপনি বাঁধলেন ?'

সুকুমার বলল, 'বাঁধন তাহলে স্বীকার করছেন ?'

আরতি বলল, 'এ রকম জুলুম করলে, স্বীকার না করে উপায় কি ?'

মুখে বললেও সুধাংশু যে আরতিকে দুদিন না যেতে সত্যি সত্যিই ছাড়িয়ে দেবে এটা শীলা ভাবতে পারে নি। অবশ্য আরতির তাতে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। মাইনে-পত্র বুঝে নিল। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে শীলা আর সুধাংশু সম্বন্ধে আবার দু-একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করল, তারপর বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। শীলা ভেবেছিল আরতির হয়ে সুধাংশুকে অনুরোধ করে দেখবে। কিন্তু শীলাকে সে সুযোগ, সে সময় আরতি দিল না। আর শীলার মনে হল তা করেও কোন ফল হত না, কে জানে বাড়ির অবস্থা কেমন। কিন্তু আরতির চাকরি করা যে শখ ছাড়া কিছু নয়, শীলার তা বুঝতে বাকি থাকে নি। শীলার ওপর বাড়তি কাজের ভার যেমন সুধাংশু চাপিয়েছে তেমনি ওর মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছে। মাইনে বাড়ানো ঠিক নয়, অ্যালাউন্স হিসেবে আরো পঁচিশ টাকা বেশী দেওয়া হবে শীলাকে।

খবরটা বাড়িতে জানাজানি হতে দেরি হল না। এ সংসারে পঁচিশ

টাকা আজ পাঁচশ টাকার সমান। মনোরমা বললেন, 'তিল কুড়িয়ে তাল, এ চাকরিতে মেয়ের উন্নতি আছে তোমরা দেখে নিও।'

বৌদি খুশী হয়ে বললেন, 'এখন থেকে টিফিনে তোমাকে যা-তা কিনে খেতে দেব না। টিফিন আমি বাড়ি থেকে করে দেব।'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ এখন দাদার মত কৌটো কিনি একটা।'

জ্যোৎস্না বলল, 'দোষ কি ? দাদা কেন, দেখ গিয়ে সব চাকুরেই কৌটোয় করে টিফিন নিয়ে যায়।'

'তারা চাকরি করে। এ আবার একটা চাকরি নাকি ?'

'ও এতে বুঝি মন উঠছে না ? কিন্তু মনিবের নজরে পড়লে পঁচিশ পাঁচশ হতে কতক্ষণ ?'

শীলা মনে মনে ভাবল, এরা তো জানে না, তা কোনদিনই হবে না।

সবাই জানল। কেবল সুকুমারই জানল না খবরটা। সুকুমার কি এখনও অভিমান করেই আছে। অভিমান বুঝি শীলা করতে জানে না। একবার ভাবল আসুক না আসুক সে নিজে যাবে না দেখা করতে। আবার ভাবল সবাই মিলে পাগলামি করে লাভ নেই। নিজে গিয়ে না ভাঙালে সুকুমারের রাগ হয়তো আরও দশ দিনেও ভাঙবে না।

শনিবারে হাফ অফিস। বাড়িতে না গিয়ে শীলা সোজা গিয়ে সুকুমারদের বাড়িতে হাজির হল। সুকুমার তখনও ফেরে নি। খবর পেয়ে রাণী-বাণী এসে জড়িয়ে ধরল। বিমলপ্রভা এগিয়ে এসে বললেন, 'এতদিনে বুঝি মনে পড়ল। জ্বরে ভুগে ভুগে চেহারার কী হাল হয়েছে দেখ।'

মেঝেয় মাদুর পেতে বিমলপ্রভা শীলাকে বসতে দিলেন ; নিজেও এসে বসলেন পাশে। তারপর খুঁটে খুঁটে ওদের বাড়ির সকলের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ; মা দাদা বউদি, ভাইপো-ভাইঝিরা কে কেমন

আছে। অজিতের আর কোন চাকরি-বাকরি হয়েছে কি না। শীলা বলল, 'না মাসীমা এখনো তেমন কিছু জোটে নি। গোটা দুই টিউশনি করেন, তাতে সামান্য কিছু হয়। তবে খুব চেষ্টা চলছে ; একটা জায়গা থেকে হওয়ার আশা আছে।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'বাঃ! আশা থাকবে না? চিরকাল কি লোকের দুঃখকষ্ট থাকে নাকি? তাছাড়া অজিত উদ্যোগী ছেলে। ও নিশ্চয়ই ভালো চাকরি জোগাড় করে নেবে তুমি দেখ।' শীলা এরপর আস্তে আস্তে নিজের মাইনে বাড়বার খবরটাও বলে ফেলল। অফিসের মনিব তার কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তার ওপর আরো দায়িত্ব চাপিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছেন সে কথা শুনে বিমলপ্রভা খুশীই হলেন। হেসে বললেন, 'যাক এবার তাহলে অজিত একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। অত বড় একটা সংসার চালানো কি আজকালকার দিনে চারটিখানি কথা? সংসার যারা নিজের হাতে চালায় তারাই বোঝে কি ঝামেলা ঝক্কি আজকাল পোয়াতে হয় মানুষকে।'

তারপর শীলার অফিসের কথা জিজ্ঞাসা করলেন বিমলপ্রভা। কি রকম সেখানকার লোকজন, অফিসের কর্তাদের ব্যবহারটা বা কি রকম, শীলার কাছ থেকে সব জেনে নিলেন তিনি।

শীলাদের অফিসের পরিবেশ বেশ ভদ্র, নানারকম লোকজন সেখানে যাতায়াত করলেও কারো কোনরকম অশোভন বিসদৃশ ব্যবহার শীলা লক্ষ্য করে নি শুনে বিমলপ্রভা নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'বাঁচলুম মা, উনি কত ভয়ই না দেখিয়েছিলেন ; ওসব জায়গায় নাকি কোন ভদ্রঘরের মেয়ে কাজ করতে পারে না। করলে নানা রকম বদনাম হয়। এ সব কত কথাই শুনেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা কী জান শীলা, নিজে যদি সৎ হওয়া যায়, শক্ত হয়ে ঠিক পথে থাকা যায়, যত বড় বদমাস

লম্পটই হোক সাধ্য নেই তোমার কোন ক্ষতি করে। আমি জানি তোমার মত মেয়ের সহজে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

বিনীতভাবে মাথা নীচু করে বিমলপ্রভার এই কথাটা শীলা স্মিতমুখে আশীর্বাণীর মতই গ্রহণ করল। মনের মধ্যে ভারী বল পেল। সে মায়ের মতই বিমলপ্রভাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বোধ হয় মায়ের চেয়েও ওঁকে বেশি পছন্দ করে শীলা ; কারণ এখনকার দিনের শিক্ষা-দীক্ষা রীতি-নীতির সঙ্গে বিমলপ্রভার পরিচয় আছে। ওঁর সঙ্গে নিজের রুচির অনেক মিল খুঁজে পায় শীলা। তুদিন বাদে ইনি আরো আপন হবেন। তখন আর এঁকে মাসীমা বলে ডাকা যাবে না। মা বলে ডাকতে হবে। প্রথম প্রথম কিন্তু ভারী লজ্জা করবে শীলার। তার মুখে নতুন ডাক কি রকম শোনাবে ভেবে এখনই যেন মনে মনে শীলা লজ্জিত হয়ে উঠল। ভাবল দাদার চাকরিটা যদি না যেত বিমলপ্রভাকে মা ডাকতে ডাকতে এত দিন অভ্যাস হয়ে যেত শীলার। এই যে ঘরখানায় এখনো সে বাইরের লোকের মত বসে আছে সেখানে সে নিজের অধিকার নিয়ে নিঃসংকোচে চলাফেরা করত। কিন্তু সেই শুভ দিনটি আসতে একটু দেরি করলেও তা যে নিশ্চয়ই আসবে সে সম্বন্ধে শীলার মনে কোন সন্দেহ নেই। কই ওঁদের অমতে চাকরি নিয়েছে বলে বিমলপ্রভা তো শীলাকে কোন তিরস্কার করলেন না, মন্দ বললেন না। ওঁর স্নেহ আশীর্বাদ যদি অটুট থাকে তাহলে শীলার আর ভয় কিসের ? এ বাড়ির কর্ত্রী যে তিনিই তা তো শীলার জানতে আর বাকি নেই ! শীলা চাকরি নিয়েছে বলে স্বকুমারই অবশ্য রাগ করেছে বেশি। এখন পর্যন্ত সে অভিমান করে রয়েছে। শীলার সঙ্গে এখনো সে ভালো করে কথা বলে না। তার অসুখের সময় একদিনও যে স্বকুমার গেল না সে তো তার এই অভিমানের জন্যেই। কিন্তু আজ

শীলা স্থির করে এসেছে স্কুমারের সেই অভিমান ভাঙবে। তার সঙ্গে দেখা না করে আজ আর শীলা এখান থেকে নড়বে না। স্কুমারকে আজ সে বলে যাবে, 'আমি তৈরী, তুমি যা চেয়েছিলে, আমরা যা চেয়েছিলাম এবার তার ব্যবস্থা করে ফেল, আর আমার দেরি করবার একটুও ইচ্ছে নেই।'

একটু বাদে বিমলপ্রভা ঘরকন্নার কাজের জন্যে উঠে গেলেন। ঝি মানদা অবশ্য আছে। কিন্তু তার ওপর একটুও নির্ভর করবার জো নেই; নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুই করতে জানে না মানদা। পিছনে পিছনে বিমলপ্রভার প্রায় সব সময়েই লেগে থাকতে হয়।

বাণী-রাণী এসে শীলাকে তাদের পড়বার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। 'কেবল কি মার সঙ্গেই গল্প করবেন নাকি শীলাদি? আমাদের সঙ্গে বুঝি একটা কথাও বলবেন না? চাকরি করে খুব বড়লোক হয়ে গেছেন, না?'

শীলা হেসে বলল, 'হ্যাঁ। প্রকাণ্ড বড় হয়ে গেছি। দেখছ না মাথাটা ছাদে গিয়ে ঠেকছে আমার।'

বাণী আর রাণীর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পেসল্পে কাটাল শীলা। ওদের কার কি রকম পড়া হচ্ছে, নতুন মাস্টার মশাই কাকে কেমন পড়াচ্ছেন, কাকে কতখানি বেশি ভালোবাসেন তাই নিয়ে গল্প চলল।

শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার চেয়ে তিনি তোমাদের অনেক ভালো পড়ান, না বাণী!' বাণী বলল, 'না শীলাদি মোটেই তা না। আপনি যেমন গল্প করে করে পড়াতেন উনি তা মোটেই করেন না।' রাণী বলল, 'সব সময়েই মুখ গোমরা করে আছেন।' বলে রাণী তাদের নতুন টিউটরের মুখের অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে বাণী আর শীলাও যোগ দিল।

একটু বাদে বাণী বলল, 'শীলাদি, আপনি আর আমাদের পড়াবেন না ?'

শীলা বলল, 'বলা যায় না। আবার হয়তো পড়ানো শুরু করতেও পারি।'

মুখ মুচকে একটু হাসল শীলা। বাণী হেসে বলল, 'ও বুঝেছি।'

শীলা বলল, 'কী বুঝেছ ?'

বাণী আরো এগিয়ে এসে গলা নীচু করে বলল, 'তখন একেবারে বৌদি হয়ে আসবেন, তাই না ?'

বলে হেসে উঠল বাণী।

চতুর্দশী এই কিশোরীটির প্রগলভতা এ মুহূর্তে মন্দ লাগল না শীলার। প্রশ্রয়-মেশানো মৃদু ধমকের ভঙ্গীতে বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছ দেখছি।'

বাণী বলল, 'আচ্ছা শীলাদি, তখন কি আপনি মাইনে নেবেন ?'

শীলা ওদের হাসি-কৌতুকের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, 'নেব বই কি, অনেক বেশি করে নেব।' কথাটা বলে ফেলে শীলা একটু লজ্জা বোধ করল। পাছে বেশি করে নেওয়ায় আসল মানেটা বুঝতে পেরে বাণী ফের ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দেয় তার জন্যে একটু মধুর আশঙ্কাও হল শীলার মনে।

কিন্তু বাণী কোন কথা বলবার সুযোগ পেল না। তার আগে রাণী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা শীলাদি, বউদি হয়ে আসবার পর আপনি তো ঠিক মার মত মাথায় সিঁদুর পরবেন, মাথায় ঘোমটা দেবেন তাই না ? ও বাড়ির টুলুদের নতুন বউদি তাই দেয়। কী চমৎকার সুন্দর দেখায় জানেন ?'

বিমলপ্রভা জলখাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, 'কী গল্প হচ্ছে তোমাদের ?'

শীলা তাড়াতাড়ি আসল গল্পের কথাটা চাপা দিয়ে বলল, 'ওদের পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম মাসীমা। কিন্তু এ কি কাণ্ড করেছেন বলুন তো! এত সব কার জন্যে? আমি এখন কিছু খাব না।' বিমলপ্রভা বললেন, 'আহা অফিস থেকে তো ফিরেছ। পেটে কিছু না পড়লে এত খাটুনিতে শরীর ঠিক থাকে?'

শীলা বলল, 'কিন্তু আপনি কেন বয়ে নিয়ে এলেন। ডাকলেই তো আমি রান্নাঘরে যেতে পারতাম। না কি অফিসে ঢুকেছি বলে রান্নাঘরে ঢোকা বারণ!'

বিমলপ্রভা হেসে বললেন, 'দুষ্টু মেয়ের কথা শোন।'

কী একটা কাজে তিনি ফের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে শীলা গলা নামিয়ে বাণীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দাদা এলেন না! আজ তো শনিবার।'

বাণী বলল, 'শনিবার হলে কী হবে, দাদা আজকাল ভারি রাত করে বাড়ি ফেরে। আপনি বুঝি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন শীলাদি! দাদার অনেক রাত হয়ে যায় ফিরতে।'

কিন্তু শীলার মন বলছে আজ আর তার দেরি হবে না, আজ সে তাড়াতাড়িই ফিরবে। শীলা যে তার জন্যে অপেক্ষা করছে এ কথা কি সুকুমার মনে মনে টের পাচ্ছে? ঠিক শীলার মতই চঞ্চল হয়ে উঠছে না তার মন?

কিন্তু সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার পর আরো ঘণ্টা দুয়েক রাত হয়ে গেল তবু সুকুমারের ফিরবার নাম নেই। বাণী-রাণীদের মাস্টারমশাই আজ আসবে না। শীলা ওদের পড়াবার অছিলায় এতক্ষণ দেরি করছিল। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। শুধু বাড়ির সবাই চিন্তিত হয়ে উঠবে বলে নয়, শীলার পক্ষে এ বাড়িতে আর বেশিক্ষণ দেরি করা ভালো

দেখায় না বলে। শত হলেও অন্য লোকের বাড়ি। এখানে অযাচিতভাবে এসে কত রাত অবধি থাকতে পারে শীলা। এ বাড়ির সবাই বা কী মনে করছেন। নিশ্চয়ই ওঁরা ভাবছেন মেয়েটা কী হ্যাংলা, মেয়েটা কী নির্লজ্জ।

বিদায় নেওয়ার জন্যে এবার উঠে পড়ল শীলা। যাওয়ার সময় বাণীকে আড়ালে ডেকে একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার দাদা এলে বোলো আমি এসেছিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গেছি। সে যেন আমাদের বাড়িতে কাল একবার যায়। খুব দরকার আছে।'

বাণী হাসি গোপন করে বলল, 'বলব শীলাদি। দাদা আসা মাত্রই বলব।'

বিমলপ্রভা শীলাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে এস।'

শীলা বলল, 'আসব মাসীমা।'

জনবিরল পথ ধরে অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ এগিয়ে যেতেই শীলা থমকে দাঁড়াল। উলটো দিক থেকে স্বকুমার ফিরছে। শীলার মন. যা বলে তা কি না হয়ে যায়। স্বকুমারের সঙ্গে আজ তার দেখা হবে এ কথা সে নিশ্চিত জানত। দেখাটা বাড়িতে না হয়ে পথে হয়ে গেল। এ এক রকম ভালোই হল। ঠিক আগের মত একসঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটা যাবে। অনেকদিন সেভাবে পথ চলার আনন্দ থেকে শীলা বঞ্চিত আছে।

শীলাকে দেখে স্বকুমারও থেমে পড়েছিল। বলল, 'এত রাত্রে তুমি যে এদিকে।'

কেমন যেন নিস্পৃহ উদাসীন কথা বলবার ভঙ্গী স্বকুমারের। শীলা

মনে মনে হাসল। এখনো আগের সেই রাগ বজায় রেখে চলেছে সুকুমার। এতদিনেও তার অভিমান এখনো ঘোচে নি।

শীলা হাসি চেপে বলল, 'গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে। গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল। এবার বাড়ি যাচ্ছি।'

সুকুমার বলল, 'হ্যাঁ তা যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। পথে আর দেরি করা ঠিক নয়।'

শীলা একটু আহত হল। এখন রাগ মিটল না সুকুমারের? একি ছেলেমানুষের মত অবুঝপনা। কই শীলার মনে তো এখন আর কোন রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। সুকুমারই কি কম খারাপ ব্যবহার করেছে নাকি তার সঙ্গে? কিন্তু শীলা তো সে কথা মনে করে বসে নেই!

সুকুমার চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছিল, শীলা বাধা দিয়ে বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছ যে! আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার জন্যে বসে রইলাম আর তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছ?'

সুকুমার বলল, 'কী বলব বল।'

শীলা বলল, 'কী বলবে তা কি আমাকেই বলে দিতে হবে? আচ্ছা চল, আমিই বলে দেব। আমার আজ অনেক কথা বলবার আছে।'

সুকুমার বলল, 'আর একদিন শুনব শীলা। আজ আমি বড় ক্লান্ত।'

শীলা জোর করে বলল 'চল আমাকে খানিকটা এগিয়ে দেবে। তাহলে আর কোন ক্লান্তি থাকবে না। তোমার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে। না শুনলে তোমাকে আজ আর আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।'

সুকুমার ঠোঁট কামড়ে একটু-কি ইতস্তত করল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা চল।' ওর ভাব দেখে মনে হল ও যেন মনে মনে

কি সঙ্কল্প করে ফেলেছে। শীলা ওর গলার স্বরের এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করলেও তেমন বিস্মিত হল না। সুকুমার হয়তো একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ শীলা যা ওকে বলবে তাতে সব বিরক্তি কেটে যাবে সুকুমারের।

দুজনে এসে বসল পার্কের সেই পুরোনো বেঞ্চটায়। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে শীলা একটু দেখে নিল। ধারে কাছে লোকজন নেই। এখনো লোকের কৌতূহলী চোখকে ভয় করে চলতে হয়। কিন্তু আর কদিন বাদে তাদের এই মিলন সামাজিক অনুমোদন পাবে, তখন আর কোন সংকোচ কি ভয়ের কারণ থাকবে না।

শীলা ভেবেছিল সুকুমারই কথা আরম্ভ করবে। কিন্তু সে চুপচাপ আছে দেখে শীলা বলল, 'তোমার কী হয়েছে বল তো। কী এত ভাবছ।'

সুকুমার গম্ভীরভাবে বলল, 'কিছুই ভাবছিনে। তুমি কী বলবে বলছিলে বল এবার।'

শীলা একটু ইতস্তত করে মৃদুস্বরে বলল, 'কী বলব তা কি তুমি নিজেই জান না? আমাদের আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই। ন্যাশনাল ড্রাগসে দাদার একটা চাকরির কথা চলছে। খুব সম্ভব সামনের মাস থেকে হয়ে যাবে কাজটা। তাহলে আমার সাহায্যের আর ততটা দরকার থাকবে না।'

সুকুমার বলল, 'তাই না কি?'

শীলা তরল স্বরে বলল, 'আচ্ছা তুমি যেন কিছুই বুঝতে পারছ না। আমাদের আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই। এবার যাও আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

সুকুমার একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু তুমি না বলতে

পারলেও আমাকে পারতে হবে। তুমি যা বলছ তা আর হবার নয় শীলা। যে লগ্ন এসেছিল তা বয়ে গেছে, তা আর ফিরবার নয়।'

শীলার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এ তো ঠাট্টা-পরিহাস মান-অভিমানের সুর নয়। এ কথা সুকুমারের অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করা সিদ্ধান্ত। এর আর নড়চড় হবে না। তবু শীলা ক্ষীণ চেষ্টা করল। মৃদুস্বরে বলল, 'বয়ে গেছে, পাঁজিতে কি লগ্ন ওই একটিই ছিল!'

সুকুমার বলল, 'তুমি সব জেনে শুনে ভান করছ। পাঁজিতে কত লগ্ন আসে কত লগ্ন যায়। কিন্তু জীবনের লগ্ন একবার ভ্রষ্ট হলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।'

হঠাৎ এক তীব্র ঈর্ষায় শীলার সর্বাঙ্গ মন জ্বলে উঠল, সে জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল, 'এসব কথা কার কাছে শিখেছ? আরতির কাছে? এবার বুঝি সেই নতুন লগ্নের পালা চলছে?'

সুকুমার বলল, 'সে কথা জিজ্ঞেস করবার তোমার কোন অধিকার নেই শীলা।'

'অধিকার নেই?'

সুকুমার তীব্রস্বরে বলল, 'না, সুধাংশু রায়ের সঙ্গে চক্রান্ত করে তার চাকরি খেয়ে তুমি অধিকার খুইয়েছ।'

শীলা প্রতিবাদ করে উঠল 'মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে। এসব কথা তোমাকে কে বলেছে শুনি?'

সুকুমার বলল, 'যেই বলুক। কথাটা জানতে কারও বাকি নেই। অন্যায়কে কেউ চেপে রাখতে পারে না শীলা। তুমিও তার চেষ্টা কোরো না। রাত অনেক হয়েছে। তুমি এবার বাড়ি যাও।'

শীলাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সুকুমার হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

খানিকক্ষণ সেই বেঞ্চে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শীলা। তারপর দেহটাকে অতিকষ্টে কোন রকমে বাড়ি পর্যন্ত টেনে এনে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল শীলা, তার মুখ থেকে ক্ষীণ আর্তস্বর এল, 'মাগো!'

শীলার মা নিরুপমা ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে রে শীলা, অমন করছিস কেন? এত রাতই হল বা কেন আজ? কোথায় ছিলি বল তো!'

একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন নিরুপমা। কিন্তু শীলা কোন কথারই জবাব দিল না।

জ্যোৎস্নাও শাশুড়ীর পায়ে পায়ে ঘরে এসেছিল। এবং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ননদের দিকে। শীলা কোন কথা না বলায় জ্যোৎস্না নিরুপমাকে বলল, 'আপনি ওঘরে যান মা, আমি কী হয়েছে না হয়েছে ওর কাছ থেকে সব শুনি।'

একথায় নিরুপমা আরও ঘাবড়ে গেলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী এমন হয়েছে যা আমার কাছে বলতে পারবে না। সর্বনাশী কোত্থেকে কী ঘটিয়ে এসেছিস এখনো আমাকে বল। আমার কাছে কিছু লুকোসনে শীলা।'

শীলা এবার মুখ তুলে মার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর তীব্রস্বরে বলল, 'মা! তোমরা আমাকে কী ভেবেছ বল দেখি, কী ভেবেছ তোমরা। যাও এখান থেকে। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও! দোহাই তোমাদের!'

নিরুপমা আর কোন কথা না বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। জ্যোৎস্না এসে শীলার শিয়রের কাছে বসল। তারপর আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শীলা খুলে বল আমাকে। লক্ষ্মী বোন আমার।'

এতক্ষণ সমস্ত পরিবারের ওপর একটা তীব্র বিদ্বেষবোধে মন আচ্ছন্ন হয়েছিল শীলার। এদের জন্যেই তো তাকে সব কিছু হারাতে হল। এদের মুখের দিকে চেয়ে সে সুকুমারের কথায় রাজী হতে পারে নি। আর আজ সুকুমার তার শোধ নিচ্ছে। ছি-ছি-ছি, এমন অপমান জীবনে তাকে আর কেউ করে নি। মেয়ে হয়ে নির্লজ্জ উপযাচিকার মত কেন গিয়েছিল শীলা। কেন অত বিশ্বাস করেছিল, কেন ভেবেছিল সে তার মান রাখবে। এখন যে নিজের কাছে নিজের মুখ দেখাবার কোনই জো রইল না শীলার।

জ্যোৎস্না একটু বাদে আর-একবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না শীলা, আমি তোমার দিদির মত, আমাকে বন্ধুর মত ভেব ভাই। আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।'

মা আর বউদির আশঙ্কার ধরন দেখে শীলা একটু হাসল। বলল, 'তোমরা যা ভেবেছ বউদি তা নয়, কোন গুণ্ডা আমাকে ধরে নিয়ে যায় নি, মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে রাখে নি। সে ধরনের কোন বিপদ হয় নি আমার।'

জ্যোৎস্না একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আহা, তাই আমরা বলছি নাকি। এত রাত্রে বাইরে থেকে এসে অমনভাবে কাউকে ধপাস করে শুয়ে পড়তে দেখলে মানুষের বুঝি ভাবনা হয় না!'

শীলা বলল, 'না বউদি আমার জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। যার জন্যে ভাবা দরকার তার জন্যে ভাব গিয়ে। দাদা বাড়ি ফিরেছে?'

জ্যোৎস্না বলল, 'বাড়ি ফিরলে বুঝি সাড়াশব্দ পেতে না! কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন শীলা। কী হয়েছে বল আমাকে। লক্ষ্মী বোন, আমার কাছে কিছু লুকিও না।' সস্নেহে আর-একবার ওর পিঠে হাত দিল জ্যোৎস্না।

রূঢ়ভাষিণী বউদির এই স্নেহকোমল কণ্ঠ হঠাৎ শীলার হৃদয়ে আবেগের সৃষ্টি করল। মনে হল যেন অনেককাল বাদে নতুন করে ফিরে পেল বউদিকে। যে বউদি দরিদ্র সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল, সে যেন তার কাছে এসে বলল, 'শীলা আমি আছি। তোমার সব দুঃখের কথা শোনার জন্যে আমি রয়েছি।'

শীলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলল, 'এসব কথা বলেও কোন লাভ নেই, শুনেও কোন লাভ নেই বউদি। সে আমাকে আজ স্পষ্টই বলে দিয়েছে—' শীলা কথাটা শেষ করল না।

কিন্তু জ্যোৎস্না সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'থামলে কেন? কী বলে দিয়েছে বল।'

শীলা বলল, 'বলেছে বিয়ে করবে না।'

জ্যোৎস্না এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'কেন? তোমার অপরাধ?'

শীলা বলল, 'তা তো জানিনে বউদি। বোধ হয় তখন তার কথা শুনে বিয়েতে রাজী হই নি বলেই আজ সে এমন করে তার শোধ নিচ্ছে।'

জ্যোৎস্না বলল, 'সত্যি, আমাদের জন্যেই তোমার এই দশা। তখন যদি তুমি এমন একগুঁয়েমি না করতে।'

শীলা জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে দৃঢ়-স্বরে বলল, 'একগুঁয়েমি যা করেছি ঠিকই করেছি বউদি। দুঃসময়ে নিজের ভাইবোনদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, সাধ্যমত খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি। সেই দোষে যদি সে আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখে আমি বলব তখন একগুঁয়েমি করে আমি ভালোই করেছি। ভালোই হয়েছে যে তার মত লোকের হাতে আমাকে হাত মেলাতে হয় নি।'

শীলার হঠাৎ এই উদ্দীপ্ত ভাব দেখে জ্যোৎস্না মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সত্যি শীলা, তোমার দুঃখেরও কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। তোমার মত মেয়েকে যে হেলায় হারাল সে পরম দুর্ভাগা। আজ না বুঝুক, একদিন না একদিন তাকে বুঝতেই হবে।'

খানিকক্ষণ বাদে টিউশনি সেরে অজিত ফিরে এল বাড়িতে। স্ত্রীর কাছ থেকে সবই শুনল। নিরুপমারও কিছু জানতে বাকি রইল না। তিনি দুঃখ করে বলতে লাগলেন, 'আহা অমন ভালো সম্বন্ধটা এমন করে হাতছাড়া হয়ে গেল। তোদের বোকামির জন্যেই এমন হল। যেমন বোন তেমনি ভাই। এখন ও মেয়েকে বিয়ে করবে কে ?'

অজিত মাকে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর মা। বুড়ো হয়ে গেলে তবু তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান হল না। কী যা-তা বলছ তুমি। ওসব কথা অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেউ বলে ?'

নিরুপমা একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'আর বলাবলির কী আছে ? জানাজানির বাকি আছে নাকি কিছু। আমি যা বলি এখনো শোন। হাতপা গুটিয়ে বসে না থেকে যা সেখানে। তাকে গিয়ে বল এমন করে কি মানুষে মানুষের সর্ব্বনাশ করে ? আর সেই ভালোমানুষের মেয়ে গুণধর ছেলের মা জননী,—তিনি কী বলেন এখন ? মুখে মুখে দেখি কত আদর সোহাগ ঢলে পড়ত। এখন সেই ডাইনি মাগীর মুখে বুঝি আর রা নেই ?'

শীলার আর সহ্য হল না। সে বেরিয়ে এসে মার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'ফের যদি তুমি এসব ব্যাপার নিয়ে এমন বিশ্রী চেঁচামেচি কর মা, আমি হয় মাথা খুঁড়ে মরব না হয় বাড়ি ছেড়ে চলে

যাব—তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। এসব কথার মধ্যে তুমি কেন আস।'

নিরুপমা সখেদে বললেন, 'কেন যে আসি সেই তো কথা। ভাবি তো আসব না, তোদের কোন কিছুর মধ্যেই থাকব না। কিন্তু পোড়া মন বুঝতে চায় না যে।'

অজিতও এ নিয়ে সুকুমারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার দরকার বোধ করল। সে কথা জানাল ও শীলাকে। কিন্তু সে কিছুতেই মত দিল না। দাদাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি দাদা, একে আর হাটের ব্যাপার করে তুলো না।'

জ্যোৎস্নাও স্বামীকে সেই পরামর্শই দিল। বাইরের লোকে এ নিয়ে যত সোরগোল তুলবে তত বিষয়টা আরো জটিল হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব মান-অভিমানের। এ সমস্যা ওরা নিজেরাই তৈরী করেছে, নিজেরাই মেটাবে। অন্য কেউ এর ভিতরে মাথা গলাতে যাক এটা ওরা নিজেরাই পছন্দ করে না।

স্ত্রীর কথাগুলিকে একেবারে অযৌক্তিক মনে হল না অজিতের। সুকুমারের কাছে এ ব্যাপারে তার যাওয়া কতটুকু সঙ্গত হবে তা স্থির করতে না করতেই দিন কয়েক কেটে গেল। তারপর আর ভাববার সময় পেল না। একদিন সকালে ন্যাশনাল ড্রাগস কোম্পানির নামাঙ্কিত একটি খাম তার হাতে পৌঁছে দিয়ে গেল পিওন। খামের ভিতরে খবরটা শুভ। অজিতের সেখানে চাকরি হয়েছে।

বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। শীলাকে কে ভালোবেসেছিল, তাকে ফের কে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে দুঃখ কারোরই মনে রইল না।

শুধু একজন ছাড়া।

দিন কয়েক ভারি ম্রিয়মাণ হয়ে রইল শীলা। কিছুই ভালো লাগে না! সব সময় নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত, প্রতারিত মনে হয়। একটা রুদ্ধ আক্রোশে নিজের ভিতরটা যেন জ্বলে যেতে থাকে। অথচ সে আক্রোশ মেটাবার কোন উপায় নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছুটে যায় সুকুমারের কাছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে কেন তুমি এমন ছলনা করলে। কী দোষ করেছি আমি।' কিন্তু আত্মসম্মানে বাধে। ছি-ছি-ছি, এমন কথা সে ভাবতে পারল কী করে। যে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে ফের তার কাছে উপযাচিকা ভিখারিনীর মত কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবে শীলা? তা ছাড়া এ কি ভিক্ষা করে পাওয়ার বস্তু। সুকুমার একদিন তাকে ভালোবেসেছিল। আজ যদি সেই ভালোবাসা মরে গিয়ে থাকে হাজার কান্নাকাটি করেও সেই মৃত ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না শীলা। তা ছাড়া কান্নাকাটি করতে যাবেই বা কেন। পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া, একজনের স্ত্রী হওয়া ছাড়া আর কি কিছু করবার নেই? জীবনে আর কি কোন সার্থকতার পথ নেই? শীলা তা মনে করে না। যেটুকু সে লেখাপড়া শিখেছে তাতে এ বুদ্ধি তার হয়েছে—একজনের প্রত্যাখ্যানে জীবন মরুভূমি হয়ে যায় না। জীবনে করবার মত আরো নানা কাজ আছে। আর সেই কাজের ভিতর দিয়েই সবাইকে বেঁচে থাকতে হয়। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে রোজ বই আনায় শীলা। গল্প উপন্যাস নয়। শক্ত শক্ত প্রবন্ধের বই, ইতিহাস আর রাজনীতির বই। কিন্তু পড়া বেশিদূর এগোয় না, দু-চার পাতা পড়তে না পড়তেই শীলা অনমনস্ক হয়ে পড়ে। কী যে সব এলোমেলো কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে শীলা নিজেই তার খেই পায় না। নিজের চিন্তার অনুসরণ করতে গিয়ে শীলা হঠাৎ বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে। খেয়াল হয় চোখের

সামনে বই খোলা রেখে সে পিছনের কথা ভাবছে। অতীতের সেই মধুর স্মৃতি দিয়ে তার শূন্য মনকে ভরে তুলতে চাইছে। নিজের মনের এই কাঙালপনা দেখে নিজের ওপর শীলার বিরক্তির আর সীমা থাকে না। নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়। যে অযোগ্য, যার কথা একেবারে ভুলে যাওয়া উচিত, জীবন থেকে একেবারে যাকে নিঃশেষে মুছে ফেলা উচিত, সে কেন আজও শীলার গোপন মনের এতখানি দখল করে থাকে? অফিসের কাজ ছাড়াও সংসারের খুঁটিনাটি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করে শীলা। ভাইপো-ভাইঝিকে পড়াতে বসে। বউদির সঙ্গে গিয়ে রান্নাঘরের কাজে জোগান দেয়। জ্যোৎস্নার বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। মনের কোন গোপন দুঃখ আর নৈরাশ্যকে যে শীলা তার এই কর্মতৎপরতার আড়ালে ঢাকা দিতে চায় তা জ্যোৎস্না খুবই টের পায়। মাঝে মাঝে স্বামীকে সে তাগিদ দেয়, 'এবার দেখে শুনে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

অজিত বলে, 'বিয়ে দিতে চাইলেই কি ও বিয়ে করবে?'

জ্যোৎস্না বলে, 'তবু তোমাদের চেষ্টা তো করা উচিত। এমন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে কোন লাভটা হবে শুনি?'

অজিত জবাব দেয়, 'কিন্তু এখন বিয়ের কথা পাড়লেও যে কিছু লাভ হবে তা নয়। আমি তো আমার বোনকে চিনি। ওর মনের গতি-প্রকৃতি আমি সব টের পাই। বিয়ের কথা তুললে ও এখন কানই পাতবে না। বরং তাতে ফল আরো বিপরীত হবে।'

জ্যোৎস্না বলে, 'তাহলে অন্তত চাকরি থেকে ওকে ছাড়িয়ে আন। তোমার যা রোজগার হচ্ছে তাতেই কষ্টে-স্রষ্টে কোন রকমে চালিয়ে নেব। শীলার মনের যা অবস্থা তাতে আমার সংসারের জন্যে ওকে

এত খাটাতে আর ভালো লাগে না! তা ছাড়া দিন দিন ওর শরীরের কী হাল হচ্ছে দেখেছ? শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

অজিত বলল, 'হুঁ!'

দিন কয়েক বাদে অজিত সেদিন রাতে শুতে যাওয়ার আগে বোনকে ডেকে বলল, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে শীলা।'

শীলা দাদার তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়াল, 'কী, বল।'

অজিত বলল, 'ও চাকরি তুই আর করতে পারবিনে।'

শীলা বলল, 'কেন।'

অজিত বলল, 'আমার নতুন অফিসে যা পাচ্ছি তাতে যেমন করে হোক চলে তো যাচ্ছে। অত খেটে তোর আর কি দরকার।'

শীলা জবাব দিল, 'আমার চাকরিতে তোমার দরকার এখন ফুরোতে পারে দাদা কিন্তু আমার দরকার এখনো শেষ হয় নি।'

বোনের এই রূঢ়তায় অজিত কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা তুই এখন ঘরে যা শীলা; তোর শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।'

দাদাকে অত বড় একটা কড়া কথা বলে শীলা নিজেও ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। মুখ নীচু করে তক্তপোশের একধারে দাঁড়িয়ে রইল। অজিত বলল, 'তুই এবার যা শীলা, একটু ঘুমো গিয়ে; দরকার অদরকারের কথা আবার কাল তোলা যাবে।'

তবু শীলা দাদার বিছানার ধারে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'রাগ কোরো না দাদা, আমি ও কথা বলতে চাই নি।'

অজিত বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তরল স্বরে বলল,

'তোকে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। তোর কোন কথার যে কী মানে তা কি তুই বলে দিবি তবে আমি বুঝব? তোর দাদাকে অতটা গবেট মনে করিসনে।'

শীলা কিন্তু চাকরি ছাড়ল না। টাইপ করতে করতে হাত তার এত দিনে রপ্ত হয়ে গেছে। যতটা দ্রুততা দরকার তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়িই সে কাজ সারতে পারে; ভুলচুকও কম হয়; সময়টা কোন রকমে কেটে যায়; তবু মাঝে মাঝে মনে হয় কোন না কোন কাজে সময় কাটিয়ে দেওয়াই কি সবচেয়ে বড় কথা? সময় তো কোনরকমে কাটেই। কাজেও কাটে; বিনা কাজেও কাটে। কিন্তু মনের মত কাজ না পেলে কি সে সময়টা ভালো কাটল বলা যায়? সেই মনের মত কাজ যে কি তা যেন শীলা ভেবে স্থির করতে পারে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারে যে সারাদিনভর এই দু-চারখানা চিঠি টাইপ করা আর গোটা কয়েক ফাইল ঝেড়ে পুছে গুছিয়ে রাখা সেই মনের মত কাজ নয়। এতে মাস অন্তে মাইনেটা পাওয়া যায় এই পর্যন্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোন আশা-ভরসা পাওয়া যায় না।

সেদিন টাইপ-করা দুটি চিঠিতে সই করতে করতে সুধাংশু হঠাৎ বলল, 'একটা কথা যদি জিজ্ঞেস করি কিছু মনে করবেন না তো মিস্ সরকার?'

নিরালা ছোট কামরা। আর কোন লোকজন নেই। ঘরের মধ্যে শুধু সুধাংশু আর সে। মাঝখানে ছোট একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কিন্তু দেয়ালে সিনেমার খান দুই রঙীন পোস্টারে নর-নারীর প্রণয়চিত্রের ছবিগুলিকে খুব রুচিসঙ্গত বলা চলে না। শীলা এ ঘরে ঢুকলে দেয়াল-চিত্রের দিকে না তাকিয়েই কাজ সেরে চলে যায়। তবু সুধাংশু আর সেই সঙ্গে পোস্টারগুলির অস্তিত্বে শীলা কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

সুধাংশুর কথার ভঙ্গীতে একটু শঙ্কা বোধ করল শীলা। কিন্তু সেই আশঙ্কার ভাবটুকু গোপন করে খানিকটা রূঢ়স্বরে বলল, 'কিছু মনে করব না।'

সুধাংশু বলল, 'আপনি কিছু মনে করলেও কথাটা জিজ্ঞেস করা দরকার বোধ করছি। আচ্ছা সুকুমারবাবুর সঙ্গে আপনার জানা-শোনা আছে না?'

শীলা একটুকাল আরক্ত হয়ে থেকে বলল, 'মিঃ রায়, অফিসের কাজের সঙ্গে আপনার এই কৌতূহলের কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। এ প্রশ্নের জবাব আপনার না পেলেও চলবে।'

সুধাংশু বলল, 'এই সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বলে আপনি এত রাগ করবেন তা ভাবি নি। কিন্তু আমি আর-একটা কথা সঠিক ভাবে শোনবার জন্যেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আচ্ছা, সুকুমারবাবু আরতিকে বিয়ে করছেন এ কথাটা কি ঠিক? না আরও পাঁচটা বাজে কথার মত এও আরতির একটা চাল।'

শীলা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমি এ সবের কিছু জানিনে। জানতে চাইওনে। কে কাকে বিয়ে করছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই মিঃ রায়। বোধ হয় আপনারও মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

সুধাংশু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। তবে খবরটা নানা সোর্স থেকে আমাদের কানে এসেছে। তাই ভাবলাম খবরটা সত্যি কিনা আপনার কাছ থেকে শুনে নিই। তবে আরতির মত একটা যা তা ধরনের মেয়েকে কেউ যে জেনে শুনে বিয়ে করতে পারে এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সুকুমারবাবুর আপনজন যদি কেউ থাকেন এ বিয়েতে তাঁদের বাধা দেওয়া উচিত।'

শীলা বলল, 'তাঁর আপনজনের অভাব নেই। এ ব্যাপার নিয়ে আপনার আমার চিন্তা না করলেও চলবে।'

সুধাংশুকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে কাটা দরজা ঠেলে শীলা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। অফিসের দ্বিতীয় পুরুষ এক ধারে ক্যাশিয়ার ও অ্যাকাউনটান্ট বিরূপ বাবু তাঁর টেবিলের ওপর মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরতে থাকা সত্বেও হঠাৎ ভারি গরম বোধ করল শীলা। অনুভব করল পিপাসাও পেয়েছে। চেয়ারে বসে ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে বলল, 'রমেশ, এক গ্লাস জল।'

কিন্তু ঘণ্টাধ্বনিতে রমেশের সাড়া মিলল না।

কদিন থেকেই সুকুমার ভাবছে মাকে কথাটা জানানো দরকার। মিছামিছি তাঁকে একটা সংশয়ের মধ্যে রেখে লাভ কী? বিমলপ্রভা এখনও শীলাকে ঘরে আনার স্বপ্নে বিভোর। মাঝখানে শীলা তো মোটে একদিনই এসেছে এ বাড়িতে, কিন্তু সেই একদিনের আসাকে নানা প্রসঙ্গের অছিলায় হাজার বার ছেলের কানে তুলেছেন বিমলপ্রভা। সুকুমার এড়িয়ে গেছে। সেদিনের আসার খবরটাই তিনি জানেন, জানেন না ফেরার পথের ঘটনাটুকু, জানেন না তীক্ষ্ণ কয়েকটি কথার আঘাতে সব বন্ধন সুকুমার ছিন্ন করে এসেছে। কিন্তু সুকুমারেরই বা এত দ্বিধা কেন? না আর দ্বিধা নয়, সুকুমার সব স্থির করে ফেলেছে। ওটা দুর্বলতা ছাড়া কি? কবে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, তাই ধরে বসে থাকবে তেমন আদর্শবাদে সুকুমারের আস্থা নেই। শীলাকে একদিন ভালো লেগেছিল সেটা যেমন সত্য আজ ওকে বরদাস্ত করতে পারছে না সেটাও তেমনি সত্য!

আরতিকে যে ওর ভালো লাগছে, তাকে যে ও ভালোবেসেছে এটা আর পাঁচজনের চোখে হয়তো মোহ। কিন্তু পাঁচজনের চোখের চেয়ে নিজের চোখের ওপরই সুকুমারের আস্থা বেশী। তা ছাড়া মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারাটাই তো সংসারের পরম লাভ, তার বেশী কিছু সুকুমার কামনা করে না। রান্নাঘরে বঁটি পেতে বসে বিমলপ্রভা তরকারি কুটছিলেন। সুকুমার এসে সামনে দাঁড়াল।

বিমলপ্রভা মুখ তুলে বললেন, 'বলবি কিছু?'

সুকুমার আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা কি বেরিয়ে গেছেন?'

বিমলপ্রভা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'ও, কথাটা বুঝি দুজনের সামনে বলে একেবারে পাকাপাকি করে নিতে চাও। তার দরকার হবে না। ওঁকে আমি সব বলেছি। আমিও তাই বলি সুকুমার। আর দেরি করাটা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া শীলার মুখের দিকে চাইলে সত্যি কষ্ট হয়। সেদিন তোর আশায় কত রাত অবধি বসে রইল। ফের যেদিন আসবে ওকে কিন্তু আমি আর এবাড়ি থেকে যেতে দেব না, তা আমি তোমায় বলে রাখলুম।'

সুকুমার দৃঢ় গলায় বলল, 'যা ভাবছ তা হবার নয় মা।'

'কী হবার নয়?' বিমলপ্রভা সুকুমারের মুখের দিকে তাকালেন।

'আরতিকে আমি কথা দিয়েছি।'

'আরতি? আরতি কে? ও বুঝেছি।' বিমলপ্রভা একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আধ-ছোলা আলুটা ফের তুলে নিয়ে বললেন, 'শীলা সেদিন যে মেয়েটির কথা বলেছিল সেই বুঝি। ওদের অফিস থেকে যে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।'

সুকুমার বাধা দিয়ে বলল, 'চাকরি ছেড়ে যায় নি, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, আর তার মূলে আছে তোমার শীলা। যা ভাবো তা নয়।

দেখতে ভেজা বেড়ালটি হলে হবে কি? ভিতরে ভিতরে নিজের স্বার্থটুকু বেশ বোঝে। সুযোগ পেলে আরতির বিরুদ্ধে ও যে বিষ ছড়াবে এ আমি জানতাম।

গম্ভীর গলায় বিমলপ্রভা বললেন, 'মিথ্যে একজনের নামে দোষ দিসনে খোকা। কারো নামে কিছু বানিয়ে বলার মত মেয়ে নয় শীলা।'

সুকুমার রেগে বলল, 'না, আমিই সব বানিয়ে বলছি।'

ম্লান একটু হেসে বিমলপ্রভা বললেন, 'দরকার পড়লে তা বোধ হয় এখন তুই পারিস। এই জন্যেই তোমার বাড়ি ফিরতে এত রাত হয় আজকাল। কই আরতির কথা তো এর আগে একদিনও বলিস নি।'

'দরকার পড়ে নি বলেই বলি নি। তা ছাড়া এ বাড়িতে আগে থেকে কিছু বলে লাভ নেই।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'সে লাভ তোমার এখনও হবে না। এ বিয়েতে উনি মত দেবেন না।'

চড়া গলায় সুকুমার বলল, 'মানে তুমি মত দিতে দেবে না।'

বিমলপ্রভা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেবই তো না। আজ একজনকে ভালো লাগবে, কাল আরেকজনকে বিয়ে করার জন্য পাগল হবে। এসব পাগলামির প্রশ্রয় এ বাড়িতে কেউ পাবে না। সেটা তোমার জানা থাকা ভালো।'

ফিরে আসতে আসতে সুকুমার ভাবল, বিমলপ্রভার এও এক ধরনের স্বার্থপরতা। শীলাকে ঘরে আনলে, শীলাকে বউ করলে তার ওপরে যেটুকু কর্তৃত্ব চলবে বিমলপ্রভার আরতির বেলায় ততখানি নাও চলতে পারে, আসলে তাঁর এখন সেই আতঙ্ক। যত আধুনিকাই হোক মেয়েদের সেই চিরন্তনী শাশুড়ীগিরির কর্তৃত্ববোধ যাবে কোথায়?

নইলে আরতিকে বিমলপ্রভা চোখে দেখেন নি, শীলার মুখে শুনে তার কতটুকু জেনেছেন, কতটুকু বুঝেছেন যে আরতির নাম কানে যেতেই তিনি এখন বিরূপ হয়ে উঠবেন। কিন্তু সুকুমার এতে ভুলবে না, সুকুমার এতে ভয় পাবে না।

সুকুমারের সময় কাটে না, ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে চায় না, অফিসের কাজ যেটুকু নেহাতই না করলে নয় সেটুকু সুকুমার তিনটের আগেই শেষ করেছে বাকি সব ফাইল চাপা দিয়ে রেখেছে। অবশ্য সুকুমার ইচ্ছে করলে এখনই বেরিয়ে যেতে পারে, সহকর্মীরা হয়তো একটু গা টেপাটেপি করবে, বড়বাবু ভ্রূ কোঁচকাবেন কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না। কাজ যেটুকু করে সুকুমার তার মধ্যে ফাঁকি নেই। ওর ড্রাফটে কলম ছোঁয়াবেন বড়বাবুর কলমেরও এত জোর নেই। কিন্তু আজ আগে বেরিয়েই বা লাভ কী? অন্যান্য দিন আরতি এসে ছুটির আগে অপেক্ষা করে অফিসের সামনে, সুকুমার বেরোয়, তারপর যেদিকে খুশি যেমন খুশি দুজনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আজকের ব্যবস্থা হয়েছে অন্য রকম। আরতি ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক পাঁচটায় কাঁটায় কাঁটায়। আজ সুকুমার গিয়ে ওকে এগিয়ে আনবে। সুকুমার বলেছিল, 'কী দরকার রাস্তার মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবার।' আরতি জবাব দিয়েছিল, 'ভিড় বুঝি তোমার অফিসের সামনেই কিছু কম। ছেলেগুলি কি রকম আড়চোখে তাকায়, মাগো! আমার বুঝি লজ্জা করে না।' আরতির গাল দুটি একটু বুঝি আরক্ত হয়ে উঠেছিল। অফিসে বসে সুকুমার যেন আরতির কালকের সেই লজ্জাকে নতুন করে উপভোগ করল। সুকুমার এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তি পেল। সকাল থেকে বিমলপ্রভার সেই বিরূপ কঠিন মুখভঙ্গি অনবরত ওকে পীড়ন করছিল। শেষ

পর্যন্ত মা যে বেঁকে বসবে, দুজনের মধ্যে প্রকাণ্ড বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে এটা সুকুমার কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু এইটেই নিয়ম, এই রকমই হয়। ভালোবাসা যদি ফুল তাহলে তার চার পাশে কাঁটার অভাব কি? অনেক হৃদয়ে আঘাত দিয়ে তবে একটি হৃদয়কে নিজের করে একান্ত করে পাওয়া যায়।

আরতি দেরি করে নি, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কালকের সেই পুরনো সাজ। এমন কি শাড়িটা পর্যন্ত বদলায়নি। তবু ওকে কেমন নতুন নতুন লাগে সুকুমারের। আসলে সাজটাই তো সব নয়। মনের খুশি-অখুশির ছাপ কি পড়ে না চেহারায়? সুকুমারকে আসতে দেখেই আরতি খুশী হয়ে উঠেছে, ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এর চেয়ে বড় পাওনা আর সুকুমারের কী আছে? তবু মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে। যাকে মানায় সে কেন মানানমত শাড়ি-গয়না পরবে না, পরতে পাবে না। ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সুকুমার বলল, 'আজ সেই সিল্কের শাড়িটা পরে এলেই পারতে।'

আরতি বলল, 'হ্যাঁ, পুরনো কাপড়, রোজ পরে পরে ছিঁড়ে ফেলি আর কি। কেন, সিল্ক বুঝি তোমার খুব পছন্দ?'

সুকুমার বলল, 'না, সিল্ক বলে নয়, রংটা ভারি মানায় তোমাকে।'

আরতি ভুরু টেনে বলল, 'ও এই কথা!'

চা-পর্ব শেষ করে সুকুমার আরতিকে নিয়ে ঢুকল এক কাপড়ের দোকানে।

আরতি বাধা দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি কাপড় কিনতে হবে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

সুকুমার ফিসফিস করে বলল, 'তা হয়তো হয়েছে। কিন্তু কথাটা প্রচার করলে তোমারই লোকসান। অতএব চুপ।'

সুকুমার বেছে বেছে নিজের পছন্দমত একখানা শাড়ি কিনল। বিল মিটিয়ে দিল, তারপর রাস্তায় নেমে বলল, 'চল।'

'কোন দিকে?'

'যে দিকে খুশি।'

'কার, তোমার না আমার?'

'কেন, আমার।' সুকুমার শাড়িটা দেখিয়ে বলল, 'এটা যতক্ষণ আমার হাতে আছে ততক্ষণ আমি রাজা আর তুমি—' রাস্তার মধ্যেই সুকুমার আরতির একটা হাত টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'তুমি রানী।'

লজ্জিত হয়ে আরতি বলল, 'ফের বুঝি পাগলামি শুরু হল।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এসে বসল ইডেন গার্ডেনে। নিরিবিলিতে কোথাও একটু বসবার জো নেই। সেখানেও ভিড়। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ও দিকটায় তবু একটু ফাঁকা আছে, একটা বেঞ্চিতে গিয়ে দুজনে বসল। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুকুমার বলল, 'মাকে আজ সব বলেছি।'

'কী বললেন তিনি?

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে সুকুমার বলল, 'একটু কিন্তু কিন্তু করছে, তুমি ওদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাতকুলশীলা কিনা তাই! অবশ্য গোড়ায় এক আধটু ওরকম হয়, তুমি গিয়ে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' শীলা বলল, 'না না, সেটা ঠিক হবে না, ওদের একটু সময় দেওয়া ভালো, তা ছাড়া এত তাড়াহুড়ারই বা কি আছে,' তারপর মধুর ভ্রুভঙ্গি করে বলল, 'ভয় নেই, হাতছাড়া হব না।'

সুকুমার হেসে বলল, 'সে ভয় করি না। ভালো করে ধরতে জানলে, হাতছাড়া হওয়া অত সোজা নয়।'

আজ আর আঙটি দেখার অছিলায় নয় সরাসরি আরতির হাতখানা কোলের ওপর টেনে নিল সুকুমার। আঃ কী নরম আঙুল আরতির! বিকেলের রোদটুকু কখন সরে গেছে। মুখ ফিরিয়ে তাকালে স্ট্র্যাণ্ড রোডের বাঁক দিয়ে গঙ্গার একটুখানি দেখা যায়। সেই দিকে চোখ রেখে আরতি চুপ করে রইল। শুধু সুকুমার কেন পুরুষ মাত্রেই ভারি অধৈর্য; ভারি অস্থির। একটু ওদের তর সয় না। একটুও সময় দিতে চায় না। কদিনেরই বা আলাপ, এরই মধ্যে সুকুমার কতখানি এগিয়ে এসেছে দেখ।

ফেরার সময় রোজই সুকুমার আরতিদের প্রায় বাড়ি ঘেঁসে যায়, কিন্তু আরতি কোনদিন বাড়িতে যেতে বলে না। হয়তো সঙ্কোচের জন্যেই বলে না। দু দিন সুকুমার নিজে থেকে বলেছে, আরতি জবাব দিয়েছে, 'আজ নয়, আরেকদিন।' বাড়ির কাছে এসে বড় রাস্তার ওপর রিক্‌সা থামিয়ে আরতি আগে নেমে পড়ল, সুকুমারের সাথে চোখাচোখি হল একবার। একমুহূর্ত কী ভাবল, আরতি তারপর হেসে বলল, 'এস।'

খানিকক্ষণ কড়া নাড়বার পর একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে দোর খুলে দিলেন। রোগা, কালোমত চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। চোখমুখের ভঙ্গিতে ভিতরে কোন স্নেহ মায়া মমতা জাতীয় কোন কোমল পদার্থ যে আছে তা সুকুমারের মনে হল না। তাকে দেখে বরং সেই মহিলার মুখভাব আরো কঠিন হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার পূর্বেই আরতি বলল, 'মা, ইনি সেই সুকুমারবাবু। এঁর কথা তোমাকে অনেক বার বলেছি। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই।'

আরতির মা সংক্ষেপে নীরস কণ্ঠে বললেন, 'আছে। আসুন ভিতরে আসুন।'

এতক্ষণ পরে তিনি সুকুমারকে আহ্বান জানালেন।

সুকুমার তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে এবার তাঁদের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল।

বস্তির মধ্যে পাশাপাশি দুখানা ঘর। তার একখানিতে সুকুমারকে ডেকে এনে বসতে দিল আরতি। ঘরের জানালা পুব দিকে। জানালা ঘেঁষে ছোট একখানি টেবিল পাতা। তার সামনে একখানা টিনের চেয়ার। তাতে ফ্রকপরা একটি বছর দশকের মেয়ে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। আরতি তার বেণী ধরে তাকে টেনে তুলল, 'এই সতী, ওঠ, ওঠ বলছি। এই বুঝি পড়া হচ্ছে তোর?'

সুকুমার তা দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'আঃ, ওকে অমন করে টানছ কেন? আস্তে তুলে দাও না। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আরতি সে কথায় কান না দিয়ে সেই মেয়েটিকে আর-একবার ধমক দিয়ে বলল, 'আবার ঘুমোচ্ছে? যা বলছি। ঘরে গিয়ে ঘুমো।"

সতী এবার তড়াক করে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'যাই দিদি। জান, আজ আবার বিজনদা এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে ছিল তোমার জন্যে।'

আরতি আরো জোরে ধমক দিল, 'তোকে সাত রাজ্যের খবর জানাতে কে বলছে? যা এঘর থেকে।'

পাশের ঘর থেকে আরতির মার গলা শোনা গেল, 'সতী এ ঘরে আয়, তোর খাবার দিয়েছি।'

এ কথা শোনবার পর মেয়েটির মুখে হাসি ফুটল। সে একবার দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

একটু দূরে একটা পুরনো কাঠের চেয়ার দেয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে। আরতি নিজেই সেটাকে ঘরের মাঝখানে টেনে নিয়ে এল।

তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। দেখেশুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছ, না ?'

সুকুমার চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'না, অবাক হওয়ার কী আছে।'

আরতি মুখ টিপে হাসল, 'নেই বুঝি ? ভাবী শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে এর চেয়ে খানিকটা উঁচু ধারণা তোমার নিশ্চয়ই ছিল ?'

সুকুমার সে কথা স্বীকার করে বলল, 'তা হয়তো ছিল। কিন্তু বাইরের দারিদ্র্যটাই মানুষের সবচেয়ে বড় কথা নয়।'

আরতি বলল, 'যারা বড়লোক, গরিবের মন ভোলাবার জন্যে তারা ওসব কথা বলে। আর গরিবরা বোকার মত ওসব শোনা কথা মুখস্থ করে রাখে। যেমন আমার বাবা।'

সুকুমার বলল, 'তোমার বাবা আছেন ?'

আরতি বলল, 'বাঃ আছেন বইকি। দেখলে না মার মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরনে পাড়ওয়ালা শাড়ি। বাবা না থাকলে এসব কি থাকত ?'

সুকুমার একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'মানে তিনি এখানে থাকেন কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।'

আরতি বলল, 'ও, তাই বল। না তিনি এখানে থাকেন না। আমাদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও নেই। তাই তিনি কালীঘাটে আমার বড়দির বাড়িতে থাকেন। আবার দিদির সঙ্গে যখন বনিবনাও হয় না তখন এখানে চলে আসেন। সেইজন্যেই তো একখানা বেশী ঘর আমাকে রাখতে হয়েছে। আচ্ছা তুমি বোসো, আমি তোমার জন্যে চা করে আনি।'

সুকুমার একটু আপত্তি করে বলল, 'আবার চা কেন এত রাত্রে।'

আরতি বলল, 'রাত যত বাড়ে চায়ের স্বাদ তত ভালো হয়।'

পাশের ঘরে আরতির মা জানালার ধারে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েকে ইশারা করে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর গলা নামিয়ে উত্ত্যক্ত স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, তোর আক্কেলখানা কী।'

আরতি বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলল, 'কেন?'

সুধারানী বললেন, 'ছেলেটা এই প্রথম এল আর তুই অমনি হাঁড়ির খবর বলতে শুরু করে দিয়েছিস। ও কী ভাবছে বল তো।'

আরতি বলল, 'সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মা। হাঁড়ির খবর গোপন রাখতে যখন পারব না তখন যত তাড়াতাড়ি তার ওপর থেকে সরা তুলে ফেলা যায় ততই ভালো। ভয় কি মা, আমাদের এখানে যারা আসে তারা টাটকা গরম ভাতের লোভে আসে না। পচা পান্তার গন্ধই তাদের এখানে টেনে আনে।'

সুধারানী মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই থাম তো। তোর ওসব বাজে বকুনি আমায় আর ভালো লাগে না। ছেলেটিকে চা-টা কিছু দিবি তো দিয়ে আয়।'

একটি ইলেকট্রিক স্টোভ রয়েছে ঘরে। জীর্ণ বিছানা, বালিশ তক্তপোশের সঙ্গে এই আসবাবটি ঠিক মানানসই নয়। সময়ে অসময়ে এ ধরনের অতিথি আগন্তুকদের জন্যেই এই আসবাবটি কেনা হয়েছে। আরতি তাড়াতাড়ি দু-কাপ চা করে নিয়ে সুকুমারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। কী ভাবছিলে বল তো।'

সুকুমার বলল, 'কী আবার ভাবব। ভাবছিলাম এলামই যখন তোমার মার কাছে কথাটা বলেই যাই।'

আরতি বলল, 'কোন্ কথা।'

সুকুমার বলল, 'আমাদের বিয়ের কথা। আমি মন স্থির করে ফেলেছি আরতি, তোমার মাকে প্রণাম করে সে কথাটি আজই জানিয়ে যাই।'

আরতি বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, দুদিন পরেও তো জানাতে পারবে।'

সুকুমার বলল, 'না না, তোমার মাকে ডাক।'

কিন্তু সুধারানীকে ডাকতে হল না। তিনি নিজেই এসে সামনে দাঁড়ালেন। খাটো ঘোমটা আরও একটু তুলে দিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি আমাকে ডাকছ বাবা?'

সুকুমার বলল, 'হ্যাঁ, আপনি আরতির কাছে বোধ হয় সব শুনেছেন। আমি—আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

সুধারানী বললেন, 'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য বাবা। কিন্তু তোমার মা-বাবা কি এতে রাজী হবেন?'

সুকুমার বলল, 'সে জন্যে ভাববেন না। এখন যদি তাঁরা পুরোপুরি মত নাও দেন, পরে নিশ্চয়ই দেবেন সে জোর আমার আছে।'

সুধারানী বললেন, 'তোমরা যা ভালো বোঝ তাই কর বাবা। আমি আর কী বলব।'

একটু ইতস্তত করে মাথা নীচু করে তাঁকে প্রণাম জানাল সুকুমার। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আরতি তাকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল, হঠাৎ সুকুমার বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

আরতি হেসে বলল, 'কর না।'

সুকুমার বলল, 'বিজনদাটি কে?'

আরতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'নামটা একবার শুনেই মনে রেখেছ দেখছি।'

সুকুমার বলল, 'তা রেখেছি। তার কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে সতীকে তুমি যে ভাবে ধমকালে তাতে নামটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।'

আরতি সংক্ষেপে শান্ত ভাবে বলল, 'তা হতে পারে।'

সুকুমার বলল, 'ব্যাপারটা কী খুলে বলবে ?'

আরতি একটু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, না বলে কি আর পারবার জো আছে ? তবে আজ নয়, আর-একদিন শুন।'

সুকুমার স্থির দৃষ্টিতে আরতির দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর হনহন করে চলতে শুরু করল।

চলতে চলতে সুকুমার যদি একবার ফিরে তাকাত দেখতে পেত আরতির ঠোঁটে অদ্ভুত একটু দুষ্টু হাসি লেগে রয়েছে।

এঁকেবেঁকে সরীসৃপ গতিতে গলিটি পুবদিকের বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। দু-দিকে পুরনো বাড়ির সার। মোড়ে একটা বিড়ির দোকান। জনকয়েক লোক সেখানে বসে জটলা করছে। দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের টুকরো টুকরো কথা আর হাসির ছিটে সুকুমারের কানে এসে লাগল। কে একজন বলল, 'ছুঁড়িটি আবার নতুন এক শিকার জুটিয়েছে রে।'

আর-একজন বলল, 'একটি কি বলছিস, দিনে গণ্ডাখানেক করে ও শিকার জোটায়। ওই তো ব্যবসা। চাকরি-বাকরি সব ভড়ং।'

সুকুমারের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কার কথা বলছে ওরা। কাকে লক্ষ্য করে এইসব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চালাচ্ছে। সুকুমারের মনে পড়ল এই পথ দিয়ে আরতির সঙ্গে যখন তাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল তখনও এই বিড়ির দোকানের আশেপাশের লোকগুলি তাদের লক্ষ্য করে

কুৎসিত মন্তব্য করেছিল। কিন্তু সুকুমার তা গ্রাহ্য করে নি। ওরা যা খুশি তাই বলুক, তাতে সুকুমারের কিছু এসে যাবে না। ওদের যেমন রুচি বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা ওরা সেই রকমই তো চলবে। রাস্তায় তরুণ-তরুণীকে একসঙ্গে চলতে দেখলেই তো ওদের চোখ টাটায়, মুখ চুলবুল করে। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল সুকুমার তবু কিসের যেন একটা সূক্ষ্ম কাঁটা বার বার বিঁধতে লাগল। সত্যিই কি আরতিরা ভদ্র নয়, সাধারণ স্বাভাবিক গৃহস্থ নয়! আরতিরা কি শীলাদের মত নয়! তা যদি না হয় নাইবা হল! শীলার মত অমন পরিবারসর্বস্ব মেয়েকে চায় না সুকুমার। আরতির মত এমন নির্ভয় নিঃসংকোচ একটি মেয়েকেই ত'র প্রয়োজন। দিতে যার কার্পণ্য নেই, নিতে নেই লজ্জা।

'ও মশাই শুনছেন? ও মশাই ?'

যেতে যেতে চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুকুমার। ফতুয়া গায়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুকুমার বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাকে ডাকছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আর লোক কোথায় এখানে।'

সুকুমার বলল, 'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আলাপ কি আর গোড়াতে থাকে মশাই? ওই আরতির সঙ্গেও কি আপনার আলাপ শুরুতে ছিল? না এই মাস তিনেক ধরে হয়েছে?

সুকুমার চটে গিয়ে বলল, 'সে খবরে আপনার দরকার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না মশাই, আমার আর কিছুতে দরকার নেই। আমার সব দরকার শেষ হয়ে গেছে।'

সুকুমার বলল, 'তবে? তবে কী জানতে চান আপনি?'

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, 'আমি কিছুই আর জানতে চাইনে মশাই, আরতি যা খুশি তাই করে বেড়াক, যাকে খুশি বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসুক, আমি কিছু তাকে বলতেও যাব না বাধা দিতেও যাব না।'

হঠাৎ সুকুমারের কী একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, 'আপনার নামই কি বিজনবাবু?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'না মশাই, সে আর-এক হতচ্ছাড়া। আমার নাম ভবরঞ্জন দেব। এই তো আমার বাড়ি। আসুন, ভিতরে আসুন। ভয় নেই মশাই, গুণ্ডা বদমাস নই, গুমখুন হবার ভয় নেই আপনার। আমি আপনার মতই ভদ্রঘরের ছেলে।'

সুকুমার বলল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, এবার পথ ছাড়ুন, যেতে দিন আমাকে।'

ভবরঞ্জনবাবু বললেন, 'আরে মশাই যেতে তো দেবই, যেতে দেব নাকি সারারাত আটকে রাখব আপনাকে? ধরে যাকে রাখবার তাকেই রাখতে পারলাম না, আপনাকে ধরে রেখে কোন লাভটা হবে। ওদের সম্বন্ধে কতগুলি কথা আপনার জানা দরকার। আমি আপনাকে সব বলব। তারপর ভেবে চিন্তে যা আপনি করা উচিত বলে মনে করেন তাই করবেন। আসুন, আর দেরি করবেন না।'

সুকুমারের হাতখানা চেপে ধরলেন ভবরঞ্জনবাবু।

সুকুমার ভারি বিব্রত বোধ করল। ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ। না হলে আলাপ-পরিচয় নেই পথের লোককে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবেন কেন তিনি? সুকুমারের সঙ্গে তাঁর এমন কি কথা থাকতে পারে? কিন্তু একটি কথা বোধহয় আছে—একজনের কথা। আরতির নাম এই প্রৌঢ় লোকটির মুখে শুনেছে সুকুমার। বেশ বোঝা যাচ্ছে

আরতিকে ইনি চেনেন। শুধু সাধারণ চেনা-জানা নয়, আরতির সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ আলাপই যে ছিল তাও এঁর কথাবার্তা শুনে আঁচ করা যায়। তা ছাড়া বিজনের নামও তো ইনি করলেন। তার পরিচয়ও জানা যাবে। সংকোচের চেয়ে কৌতূহলটাই বড় হয়ে উঠল স্থকুমারের। একটু ইতস্তত করে বলল, 'চলুন।'

রাস্তার ওপরেই দোতলা বাড়ি। সামনে দুদিকে রোয়াক। মাঝখানে সরু সিঁড়ির ধাপগুলি ভিতরের দিকে চলে গেছে।

ভবরঞ্জনবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের একটি ঘরে নিয়ে বসালেন। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন নিজেই।

দেখেই বোঝা যায় ভবরঞ্জনের এটা বৈঠকখানা। নিচু জোড়া তক্তপোশের ওপর শতরঞ্জি বিছানো। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে খানকয়েক চেয়ারও আছে। দেয়ালগুলিতে কয়েকখানা ফটোও টাঙানো রয়েছে। একখানা পারিবারিক গ্রুপ ফটো।

নিজের কোঁচার খুট দিয়ে তক্তপোশের ধুলো ঝাড়লেন ভবরঞ্জনবাবু। বললেন, 'বাড়ি তো নয়, অরণ্য মশাই—অরণ্য। ছুঁচো-চামচিকের আড্ডা। মেয়েছেলে না থাকলে কি আর বাড়ির কোন ছিরিছাঁদ থাকে মশাই!'

স্থকুমার বলল, 'আপনার স্ত্রী বাড়িতে নেই বুঝি?'

ভবরঞ্জন বললেন, 'তবে আর বলছি কী। আমার প্রথম পরিবার মারা গেছে বাইশ বছর আগে। তবু তো ভগবান তাকে সতেরো বৎসর ঘর করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ সতেরো মাসও টিকল না মশাই। ভগবান তাকে আগেই সরিয়ে নিলেন।'

স্থকুমার বলল, 'ছেলেমেয়ে কিছু হয় নি?'

ভবরঞ্জন বললেন, 'প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে আছে। বিয়ে দিয়েছি,

এখন সব পরস্ত পর। গণ্ডা কয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে আসে। আমার জন্যে কারো কোন দরদ নেই, ব্যাঙ্কে কত টাকা জমিয়েছি, বাড়ির কত অংশ কার নামে লিখে দিয়ে যাচ্ছি কেবল সেই খোঁজ। আমি বলেছি তাদের কাউকে এক পয়সা দেব না। বিয়ের সময় যথেষ্ট দিয়েছি। আমি এ বাড়িতে অনাথ আশ্রম খুলব, হাসপাতাল খুলব, তবু তোদের ঢুকতে দেব না। তোরা আমার যে সর্বনাশ করছিস!'

সুকুমার বলল, 'কেন, কী করেছে আপনার মেয়েরা?'

ভবরঞ্জনবাবু বললেন, 'ওদের জন্যেই তো মশাই আরতির সঙ্গে আমার বিয়েটা বন্ধ হয়ে গেল, তারাই তো বাদ সাধল শেষ পর্যন্ত।'

সুকুমার একটু কাল অবাক হয়ে থেকে বলল, 'সে কি! আরতির সঙ্গে আপনারও বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল নাকি?'

ভবরঞ্জনবাবু চটে উঠে বললেন, 'এসেছিলই তো? তাতে আপনার অমন আকাশ থেকে পড়বার কী আছে? আমার কত বয়স হয়েছে মনে করেন আপনি? পাড়ার লোকে শত্রুতা করে ষাট-সত্তর যতই বলুক না, ঘরের তলায় বসে বলছি মশাই, আমার বয়স একান্ন বছরের একটি মাসও বেশি না। কিন্তু একান্নর মত কি দেখায় আমাকে? আপনিই বলুন।'

চুলে কলপ মেখে দাঁত বাঁধিয়ে বিগত যৌবনকে বেঁধে রাখবার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে সুকুমার এই বৃদ্ধের প্রতি একটু অনুকম্পা বোধ করল। হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বলল, 'না না! তার চেয়ে অনেক কমবয়সী মনে হয় আপনাকে। আরতির সঙ্গে কি করে আপনার আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা হল তাই বলুন এবার।'

ভবরঞ্জন ধীরে ধীরে সব খুলে বললেন। ভুলে গেলেন সুকুমার তাঁর

প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সহানুভূতি যে প্রচ্ছন্ন পরিহাস ছাড়া কিছু নয়, সে কথা তিনি ভাবতেও পারলেন না, বরং তাঁর ধরন-ধারন দেখে সুকুমারের মনে হল যেন এতদিনে সত্যিই তিনি একজন মনের কথা বলবার মত মানুষ খুঁজে পেয়েছেন।

বছর চারেক আগে থেকেই আরতির সঙ্গে পরিচয় ভবরঞ্জনবাবুর। তখনও তিনি রিটায়ার করেন নি। নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করেন। যে কোন ছেলে-ছোকরার চেয়ে বেশি খাটেন। একদিন বাসে করে অফিস থেকে ফিরছেন, আরতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাস কয়েক আগে এই পাড়ার বস্তী-বাড়িটায় ভাড়াটে এসেছে ওরা। ভবরঞ্জনের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ যাতায়াত করে। আলাপ না থাকলেও ভবরঞ্জন ওকে চেনেন। কণ্ডাকটার টিকিট চাওয়ায় আরতি একখানি আধুলি বের করে দিল। কণ্ডাকটার উলটিয়ে পালটিয়ে দেখে ফেরত দিয়ে বলল, 'এটা খারাপ আধুলি, পালটে দিন।'

আরতি বলল, 'আমার কাছে তো আর পয়সা নেই।'

ভবরঞ্জন এগিয়ে এসে নিজেই ওর বাসভাড়াটা দিয়ে দিলেন। এমনি করেই আলাপ। তারপর ভবরঞ্জন নিজেই গেলেন ওর খোঁজখবর নিতে। তাঁকে দেখে আরতি বলল, 'ও, আপনার পয়সাটা বুঝি ফেরত দেই নি?' এই বলে আরতি একখানা দু আনি বের করে দিতে যাচ্ছিল, ভবরঞ্জনবাবু বললেন, 'আমি ওটা ফেরত নিতে আসি নি। এমনিই এলাম তোমাদের খবর নিতে।'

খবর নিতে নিতে ভবরঞ্জনবাবু ওদের দুঃখের কথা শুনলেন, দুর্দশাটা প্রত্যক্ষ করলেন। আরতির বাবা সামান্য কাজ করেন। মাসে দু-একবার আসেন এখানে। অল্প কিছু দিয়ে যান। আরতিদের অতি

কষ্টে চলে। এর মধ্যে ওদের সম্বন্ধে পাড়ায় নানা কথা রটতে শুরু করল। কেউ বলল আরতিদের ঘরে রাত্রে লোকজন আসে, তারাই ওদের সংসার চালাবার ভার নেয়। কেউ বলল আরতি ম্যাসেজ ক্লিনিকে কাজ করে। আরো নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। কিন্তু ভবরঞ্জন কোন কথা কানে তুললেন না। আরতিকে বললেন, 'তোমার আর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। খরচ যা লাগে আমার কাছ থেকে নিও।' আরতি তামাসা করে হেসে বলল, 'আচ্ছা দাদু।'

কিন্তু কিছুদিন বাদে আরতি এক শক্ত অসুখে পড়ল। সে অসুখ ও নিজেই ডেকে এনেছিল! ওর আর বাইরে বেরোবার শক্তি রইল না। তখন আরতির মা আর বোন সকাল সন্ধ্যা দু বেলা ভবরঞ্জনের বাড়িতে আসতে লাগলেন। আরতির চিকিৎসার ব্যয়, খাওয়াপরার ব্যয় সব ভবরঞ্জনই চালাতে লাগলেন। সুস্থ হয়ে আরতি একদিন ভবরঞ্জনের বাড়িতে এল। বলল, 'চমৎকার বাড়ি তো আপনার, আর আর এত জিনিসপত্তর। এ সব দিয়ে আপনি কী করবেন, আমাকে দিয়ে দিন।'

ভবরঞ্জন বললেন, 'সব তোমাকে দেব। তুমি এখানে এসে স্থায়ী ভাবে থাক। তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে কি ওই বস্তীবাস মানায়!'

আরতি বলল, 'আপনি যদি থাকতে দেন তাহলে এখানেই চলে আসি।'

ভবরঞ্জন ভাবলেন, ও মেয়ের অনেক রকম দোষ আছে বটে কিন্তু তাঁরও তো বয়স হয়েছে। দুটি পরিবার এর আগে গত হয়েছে। বিয়ে-থা করলেই ওর সব শুধরে যাবে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তাহলে পুরুত ডেকে দিনক্ষণ সব ঠিক করে ফেলি।'

আরতি বলল, 'সেই ভালো।'

তারপর শুভদিনের কথা জানবার জন্যে যেই ওদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছেন অমনি সবাই ভবরঞ্জনকে তেড়ে মারতে এল। আরতির মায়ের হাতে ঝাঁটা, আরতির হাতে জুতো আর আরতির নতুন নাগর বিজনের হাতে লাঠি। সবাই চেঁচিয়ে বলল, 'বেহদ্দ বুড়ো বদমাশ, তোমার বিয়ের সাধ ভালো করে মিটিয়ে দিচ্ছি এস।'

ভবরঞ্জন বললেন, 'তাহলে এতদিন শুধু আমার সঙ্গে ছলচাতুরী করছ ? আমি যে এতগুলি টাকা খরচ করলাম তা ফেরত দাও।'

এর জবাবে আরতির ইঙ্গিতে তার সেই জোয়ান প্রেমিক ভবরঞ্জনকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে দিতে বলল, 'সুদটা আজ নিয়ে যাও। আসলটা পরে দেব।'

ভবরঞ্জনবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ফের বললেন, "কিন্তু একজন আছেন যিনি সব দেখেন। অন্যায় করে কেউ তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পায় না। বিজন বোসও পায় নি। চেক জাল করবার দায়ে আড়াই বছর বাছাধনকে শ্রীঘরে থাকতে হয়েছে। দিন কয়েক আগে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু পেলে কী হবে, গুড়ের মধ্যে বালি। আরতি কেবল বুড়ো মানুষকেই ঠকায় না, সব মানুষের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা। ওকি মশাই, এরই মধ্যে উঠছেন যে?' সুকুমারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ভবরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন।

সুকুমার কোন জবাব না দিয়ে সোজা বেরিয়ে এসে পথে নামল। কথা বলবার মত মনের অবস্থা তার নয়। এই হতাশ প্রেমিক বুড়ো যা বলছে তার কতটুকু সত্য কতখানি মিথ্যা সুকুমারকে তা যাচাই করে নিতে হবে।

সেদিন শীলা তাদের অফিসে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। অফিসের

দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে! কি ব্যাপার, আজ তো কোন ছুটি-ছাটা নেই। বিশেষ কারণে যদি তাদের অফিস ছুটি থাকে তাহলে সুধাংশুবাবু তো কাল তাকে বলে দিতে পারতেন। কিন্তু কাল তো এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। অফিসের দারোয়ানটির পর্যন্ত পাত্তা নেই। চাকর বেয়ারা সবাই ছুটির কথা জানল, শুধু শীলাই কিছু টের পেল না!

খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে শীলা নেমে আসছিল, হঠাৎ তার মনে হল, পাশের অফিস থেকে একবার খোঁজ নিয়ে গেলে কেমন হয়। যদি কেউ কিছু জানে।

পাশের অফিসের সামনে টুল পেতে একজন বেয়ারা বসে ছিল, শীলা তার সামনে গিয়ে দাড়াল। কথাটা জিজ্ঞাসা করবে কি করবে না ইতস্তত করছে, লোকটি নিজেই যেচে কথা বলল, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

শীলা এবার ভরসা পেয়ে বলল, 'হ্যা। আচ্ছা দেখ, আমাদের অফিসটা হঠাৎ আজ বন্ধ কেন? দারোয়ান বেয়ারাই বা গেল কোথায়?'

লোকটি একটু হেসে বলল, 'তারাও আপনার মত অনেকবার এসে এখানে খুঁজে গেছে। এখন বোধ হয় ছুটেছে সুধাংশুবাবুর বাড়ি।'

শীলা বলল, 'কেন, তাঁর বাড়ি কেন?'

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কিছুই জানেন না? ওরা আপনাকে বলে নি কিছু?'

শীলা বলল, 'না!'

লোকটি বলল, 'এখান থেকে কারবার গুটিয়ে সরে পড়েছে। বাড়ি-ওয়ালীর অনেক টাকা দেনা। আরো অনেক পাওনাদার আছে।

সবাইকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব। আমাদের বাবুরা একটু আগে বলাবলি করছিলেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আপনি ওদের কাউকে বলে দেখতে পারেন।'

শীলা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'না, আর জিজ্ঞেস করে কী হবে।'

আস্তে আস্তে জনবহুল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল শীলা। বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। এখন তার মনে পড়তে লাগল সুধাংশুবাবুদের ধরন-ধারন ইদানীং সত্যিই ভিন্ন রকম লাগছিল। কাজ-কর্মে তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি অফিসে আসতেন না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন অন্য কাজ আছে কি শরীর ভালো নেই। কিন্তু তখনও শীলার মনে কোন সন্দেহ হয় নি যে রাতারাতি অফিস এমনভাবে তালাবন্ধ করে তাঁরা সরে পড়তে পারেন। কর্মচারীদের মাইনে মেটাবার ভয়েই কি তাঁরা এই পথ নিলেন। কজন বা কর্মচারী আর ক টাকাই বা তাদের মাইনে। সে টাকাটাও ওঁরা ফাঁকি না দিয়ে পারলেন না। না, দুনিয়ায় কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো নেই, কারো ওপর আস্থা রাখবার উপায় নেই আর। কিন্তু এ একরকম ভালোই হল, সামনের দিকে এগুতে এগুতে শীলা নিজেকে প্রবোধ দিল। ভালোই হল যে এক মাসের মাইনের ওপর দিয়ে বিপদটা কেটে গেল। আরো কত রকমের কত উৎপাত তো হতে পারত। কত কলঙ্ক আর দুর্নাম রটবার আশঙ্কা ছিল। তা ছাড়া এখানে কাজ করতে তার ভালোও লাগত না। কিন্তু ছাড়ি-ছাড়ি করেও চাকরিটা ছাড়তে পারছিল কই শীলা। ভালো না লাগলেও অফিসে যাওয়াটা শেষের দিকে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভালোই হল যে সে অভ্যাসের জড়তা থেকে আজ এই ভাবে মুক্তি ঘটল শীলার। তবু হঠাৎ যেন

কেমন শূন্য শূন্য মনে হতে লাগল। যেন আর কিছু করবার নেই, আর কিছু ভাববার নেই, জগৎসংসারটা হঠাৎ যেন বড়ই ফাঁকা হয়ে গেছে। এই ফাঁক একজন ভরিয়ে তুলতে পারত। কিন্তু তার কথা আর কেন। সেই চরিত্রহীন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষটিকে শীলার ভুলে থাকাই তো উচিত। তার কথা চিন্তা করাও শীলার পক্ষে অপমান। ছি-ছি-ছি, আরতির মত অমন একটা বাজে ধরনের মেয়েকে দেখে সুকুমার ভুলল কী করে। মুখের কড়া পেইণ্ট আর শাড়ির চড়া রঙ ছাড়া আরতির কী আছে যা সুকুমারকে অমন করে মুগ্ধ করে রাখল। ওদের কথা মনে হলে ঘৃণায় রি—রি করে ওঠে শীলার সর্বাঙ্গ। অস্বস্তির আর সীমা থাকে না। শীলার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই কি সুকুমার নিজের রুচি-প্রবৃত্তিকে এমন হীন আর জঘন্য করে তুলল। না কি রুচির এই স্থূলতা গোড়া থেকে তার প্রকৃতির মধ্যেই ছিল। সেইটাই সম্ভব কেন তাই নিশ্চিত সত্য।

শীলাদের অফিস উঠে যাওয়ার খবর শুনে তার মা প্রথমে একটু বিস্মিত হলেও হতাশ হলেন না, কারণ অজিতের নতুন চাকরির আয়ে সংসারটা কোন রকমে এখন চলে যাচ্ছে।

শীলার মা বললেন, 'গেছে যাক বাপু। আর তোমার চাকরি-বাকরির দরকার নেই।'

শীলা প্রতিবাদ করে বলল, 'দরকার নেই বললেই হল। চুপচাপ বাড়িতে বসে থেকে কী হবে। তার চেয়ে মাস্টারি-টাস্টারি যাহোক কিছু জুটিয়ে নেব।'

নিরুপমা বললেন, 'জুটিয়ে নিতে চাইলেই জোটাতে দিলাম আর কি। এতদিন তোমাকে নিজের ইচ্ছেমত চলতে দিয়েই তো হল

আজ এই দশা। আমি তোমার সম্বন্ধ ঠিক করে রেখেছি। তোমাকেও তারা দূর থেকে দেখেছে। তাদের কোন দাবিদাওয়া নেই। আমরা যা দিতে পারি তাই নেবে। এমন সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেব না আমি। যদি আমার কথা কেউ না শোন, আমি যেদিকে চোখ যায় চলে যাব। তোমাদের সংসার নিয়ে তোমরা থাকবে!'

ব্যাপারটা বউদির কাছ থেকে আরো বিশদ ভাবে জানতে পারল শীলা। ব্যারাকপুরের জিতেন দাসরা বৌদির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। জিতেন সেখানকার মুন্সেফ কোর্টে প্র্যাকটিস করে। অবস্থা মোটামুটি ভালোই। সে এতদিন বিয়ে করবে না বলেই ছিল। এখন হঠাৎ সুমতি হয়েছে। বয়স অবশ্য একটু হয়েছে। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। তা আজকালকার ছেলেদের পক্ষে এ বয়স একটা বয়সই নয়। জিতেনের খুবই আগ্রহ আছে। এবার শীলা রাজী হলেই শুভকাজটা সেরে ফেলা যায়।

নিরুপমা বললেন, 'ও রাজী হবে না ওর ঘাড় রাজী হবে।'

শীলার দাদা অজিতও মার কথাই সমর্থন করল। বোনকে একান্তে ডেকে বলল, 'সুকুমারের কাণ্ডকারখানা তো শুনেছিস। কী একটা যা তা মেয়ের সঙ্গে দিনরাত যেখানে সেখানে টো টো করে বেড়াচ্ছে। ওর নিন্দেয় পাড়া ভরে গেছে। তুই ওকে ভুলে যা শীলা। ও মনে রাখার মত মানুষ নয়।'

শীলা বলল, 'কে তাকে মনে রাখতে যাচ্ছে দাদা!'

অজিত বলল, 'শুনেছি সে নাকি সেই হতচ্ছাড়া মেয়েটাকে বিয়ে করছে। ওর বাবা-মার মত নেই তা সত্ত্বেও সে পেছপাও হচ্ছে না। তুই কেন তার কথা চিন্তা করে দুঃখ পাবি শীলা।'

শীলা বলল, 'দুঃখ তো আমি পেতে চাই না দাদা।'

অজিত বলল, 'কেন চাইবি? এ ধরনের দুঃখবরণে মানুষের

গৌরব বাড়ে না। বরং সে ছোট হয়ে যায়। তুই কেন ইচ্ছা করে ব্যর্থ হবি বোন। তার চেয়ে নিজের হাতে নতুন সংসার নতুন জীবন গড়ে তোল। স্বামীর মধ্যে, সন্তানের মধ্যে তোর সব সাধনা সার্থক হয়ে উঠুক।'

শীলা একটু হেসে বলল, 'দাদা তুমি আজকাল বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ তো। ঘরকন্না ছাড়া মেয়েদের সার্থক হওয়ার কি আর কোন পথ নেই?'

অজিত বলল, 'থাকবে না কেন? কিন্তু সব পথই ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। না হলে পথের আলাদা কোন মূল্য আছে?'

শীলা বলল, 'আচ্ছা তোমার কথাটা ভেবে দেখব দাদা।'

জ্যোৎস্না বলল, 'আর তোমার ভাবাভাবির দরকার নেই ভাই, সব ভাবনা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

অনেক তর্ক-বিতর্ক ওজর-আপত্তির পর শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল শীলা। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'কর তোমাদের যা ইচ্ছে।'

ছেলে যে এতখানি মার মন জুড়ে আছে এই কদিনে বিমলপ্রভা সে কথা যেন নতুন করে টের পেলেন। এর আগে চাকরির প্রয়োজনে সুকুমার কতবার বাইরে গিয়ে রয়েছে, তখন সম্বল ছিল শুধু চিঠি। তাও কত তাগিদ-তাগাদার পর সুকুমারের চিঠি পাওয়া যেত, বিমলপ্রভা তাতেই খুশী থাকতেন, কিন্তু এখন সুকুমার কলকাতায়ই আছে, কাছেই আছে। তবু যেন কতদূর মনে হয়। সকালে বিকালে ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন, সামনে বসে খেতে দিচ্ছেন, কিন্তু এ যেন আরেক সুকুমার। কারণটা অবশ্য বিমলপ্রভার জানতে আর কিছু বাকি নেই। আরতির সব কথা, তার সব ইতিহাস তিনি এর মধ্যে

জেনে ফেলেছেন আর সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস চেপেছেন। এ কী মতিভ্রম সুকুমারের। ছেলের বয়স হয়েছে, ভালোবাসবে, ভালোবেসে বিয়ে করবে সে তো সুখের কথা, কিন্তু তাই বলে আরতির মত একটা মেয়েকে। ছি ছি! যার সুকীর্তির কথা জানতে কারো বাকি নেই, পাড়াময় যার নামে ছি ছি পড়ে গেছে, তেমনি একটা মেয়ের মোহে সুকুমার পাগল হল! এ বিভ্রম যেন সুকুমারের নয়, এ বিভ্রম যেন তাঁর নিজেরই। অবশ্য বিমলপ্রভা জানেন এ বদ নেশা সুকুমারের একদিন ছুটে যাবে, সুকুমার নিজেই একদিন বুঝতে পারবে কতবড় ভুল সে করে বসেছিল। তারপর মায়ের কাছে মাথা নীচু করে বলবে, মা আমিই ভুল করেছিলাম, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু মাঝখানের সেই কটা দিন বিমলপ্রভা ধৈর্য ধরেন কী করে? দিনের অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা ভুলে থাকার ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছে। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের উৎসাহে নিজের বাড়িতেই একটা ছোটখাটো শিশুসদনের মত খুলে দিয়েছেন বিমলপ্রভা। বাইরের ঘরটা প্রায় খালিই পড়ে থাকে। আগে সুকুমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এ ঘরটায় আড্ডা দিত। কিন্তু এখন সুকুমারের সে সময় কোথায়। সুকুমারের আড্ডার স্থান বদলেছে, কাল বদলেছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে রাণী-বাণীকে নিয়ে বিমলপ্রভা তাঁর স্কুলে এসে বসেন। ছেলেমেয়েদের মায়েরা অবশ্য কিছু কিছু মাইনে দিতে চেয়েছিলেন। দুপুরবেলা দু দণ্ড সুস্থ হয়ে থাকার মাশুল। কিন্তু বিমলপ্রভা রাজী হন নি, হেসে বলেছেন, স্কুলটা আরেকটু বড় হোক, দু-চারটে মাস্টারনী পুষি, তখন তো মাইনেপত্তরের হিসাব। আমাকে কারো মাইনে দিতে হবে না। পাশের বাড়ির উকিল-গিন্নী নমিতার সংখ্যায় চারটি। বইপত্তর যদি বা কিনে দিয়েছে, নিয়ে

বসবার সময় কোথায়? কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে জামা ইস্ত্রি করা। সংসারের হাজার কাজ, অথচ হাত তো মোটে দুটো। কৃতজ্ঞতায় উথলে উঠে নমিতা বলে, 'ধৈর্যের তোমার বলিহারি যাই বিমলদি, আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতাম।' বিমলপ্রভা নিঃশব্দে আবার একটু হাসেন।

কিন্তু নতুন স্কুলের খবরদারি তো বিকেল চারটে পর্যন্ত। আবার যে কে সেই। একেক সময় ভারি ক্লান্ত হয়ে ওঠেন বিমলপ্রভা। ভাবেন অন্যরকমও তো হতে পারত, কেবল সুকুমারের খামখেয়ালির জন্যেই তা হল না। বউ হয়ে শীলা এসে উঠতে পারত এ বাড়িতে। একটি শান্ত সংযত মেয়ের এ ঘরে ও ঘরে ঘোরাফেরা। বিমলপ্রভা কল্পনায় তা যেন দেখতে পান। সুকুমার তার কদর বুঝল কোথায়? মাঝে মাঝে ভারি রাগ হয় ছেলের ওপর। স্বামীকে সব কথা বলে দেবেন নাকি তাঁকে চটিয়ে। শশধরের রাগ তো জানেন—তাহলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র সেদিন আপনিই বেধে গেল, বিমলপ্রভাকে আর বাধাতে হল না। সুকুমার বেশ একটু রাত করেই বাড়ি ফিরল। অন্যদিন কড়া নাড়ার মৃদু শব্দ হলেই বিমলপ্রভা নীরবে এসে দরজা খুলে দেন। কিন্তু দরজা খুলে দিতেই সুকুমার সামনে তাকিয়ে দেখল মা নয়—বাবা। শশধর কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। বিরক্তিতে ভ্রুকুটি-বঙ্কিম মুখ। দরজার হুড়কো দিতে দিতে শশধরবাবু বললেন, 'রাত দশটার আগে বুঝি একদিনও বাড়ি ফেরা যায় না?'

সুকুমার সংক্ষেপে জবাব দিল, 'কাজ ছিল।'

শশধর ভেংচি কেটে উঠলেন, 'কাজ ছিল। কত বড় কাজের লোক হয়ে পড়েছে। রাত দশটার পরও যার কাজ থাকে সে কাজ তো অকাজ, তাকে বলব কুকাজ। ভাব যে আমি কিছু টের পাই না, না?'

ফিরে দাঁড়িয়ে সুকুমার বলল, 'সুকাজ কুকাজ বোঝবার বয়স আমার হয়েছে, আপনি আস্তে কথা বলুন। চেঁচিয়ে পাড়া মাতাবার মত কিছু হয় নি।'

'হোয়াট' !' শশধরবাবু ফেটে পড়লেন, 'জান তুমি কার বাড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছ ?'

সুকুমার হেসে বলল, 'জানি এ বাড়ি আমারও নয় আপনারও নয়, এটা ভাড়াটে বাড়ি। তবু ভাগ্য যে ভাড়াটে বাড়ি, নিজের বাড়ি হলে যেন কী-ই করতেন।'

পাশের ঘর থেকে বিমলপ্রভা সব শুনছিলেন, তাঁর আর সহ্য হল না। তিনি সামনে এসে বললেন, 'রাত দশটার পর বাড়ি ফিরে কথা কাটাকাটি করতে তোর লজ্জা করে না খোকা।'

সুকুমার যেন ভারি অবাক হয়ে গেছে এমনিভাব করে বলল, 'ও তাই বল, আসল ইন্‌স্পিরেশন তাহলে তুমি।'

ছেলের মুখের এই মিথ্যা অপবাদে বিমলপ্রভা স্থানকাল ভুলে গেলেন, বললেন, 'হলেই বা দোষ কী ? রাত দশটা অবধি তুমি আরতির বাড়ি পড়ে থাকবে তাতে দোষ নেই, আর সে কথা কেউ বলতে গেলেই যত দোষ।'

সুকুমার জবাব দিল, 'আরতির সম্বন্ধে তুমি অমন ইতরের মত কথা বোলো না মা। সে গরিবের মেয়ে হতে পারে, অভদ্র নয়, তোমাদের মত ইতর নয়।'

শশধরবাবু বললেন, 'আরতি ? আরতি আবার কে ?'

বিমলপ্রভা বললেন, 'জিজ্ঞেস কর তোমার গুণধর পুত্রকে।'

জিজ্ঞেস করতে হল না, সুকুমার নিজে থেকেই বলল, 'আরতি,

একটি ভদ্রঘরের মেয়ে, আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এর বেশী আপনার জানবার দরকার নেই।'

শশধরবাবু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, বিয়ের পর বউ নিয়ে ওঠার জন্যে, ঘরও ঠিক করেছ নিশ্চয়ই।'

সুকুমার বলল, 'হ্যাঁ, তা করেছি।'

ঘর ঠিক করাটাই তো বড় কথা নয়, আরতিকে নিয়ে এ বাড়িতে ওর যে স্থান হবে না সেটা সুকুমারও ভেবে রেখেছে। ঘর একটা খুঁজে নিলেই হবে, কলকাতায় না হোক শহরতলীর কোথাও ঘর পাওয়া যাবেই। কিন্তু সেদিনের ভবরঞ্জনের কথাগুলো মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিজনদার অস্তিত্ব আরতিও অস্বীকার করে নি। আসলে তা হলে ব্যাপারটা কী? কতটুকু সত্য? ভবরঞ্জনের মত বেকুব প্রেমিক সত্য ঘটনার ওপর মিথ্যের রঙ ফলাবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। আরতিকে অত ছোট বলে অত নীচ বলে ভাবতে মন চায় না। সুকুমার তো দেখেছে গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের কত মেয়ে জীবিকার দায়ে চাকরিতে লেগেছে, পাঁচজন পুরুষের সংস্পর্শে আসছে। তাই বলে কি তারা খারাপ? নাকি তাদের এই ভালো হবার, সমর্থ হবার রূপটাই আচমকা চোখে লেগে অনেকের চোখে খারাপ ঠেকছে। অথবা ধর যদি তাই হয়, যদি বিজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপই থেকে থাকে, বন্ধুত্ব থেকে থাকে তাতেই বা দোষ কী? সেটুকু সহ্য করবার ঔদার্য সুকুমারের আছে। আরতিদের বাড়ি গিয়ে প্রথম দিনেই সুকুমার বিজন সম্বন্ধে একটু কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছে। সেই পুরনো কথা মনে পড়ায় সুকুমারের যেন লজ্জা করতে লাগল। ভবরঞ্জনের কথাগুলি যাচাই করে দেখতে হয়। সেদিনের ব্যবহারের সে কৈফিয়ত হিসাবেই যেন সুকুমার পরদিন অফিস-অন্তে আবার এল আরতিদের বাড়ি।

আরতি কী একটা কাজে বেরিয়েছে তখনও ফেরে নি, কিন্তু সুধারানী আছেন। তিনি আদর করে সুকুমারকে ঘরে নিয়ে বসালেন। জল গরম করে এনে কেটলি কাপ নামিয়ে চা করতে বসলেন। তক্তপোশের ওপর বালিশ কোলে নিয়ে আরাম করে বসল সুকুমার। সস্তা চায়ের কাপ, ছোট একটা টিনের ছাঁকনি, নলভাঙা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড চিনেমাটির কেটলি একটা। আছে সবই, শুধু ডিমিনিউটিভ ফর্মে। ভদ্রতা করে সুকুমার বলল, 'চা তো খেয়ে এসেছি, আপনি আবার কেন চা করতে গেলেন।'

সুধারানী বললেন, 'না বাবা, একটু চা করি খাও। সেদিনও এসে শুকনো মুখে ফিরে গেছ। আর আছেই বা কী, দেওয়ার মধ্যে তো শুধু একটু চা। সবই তো গেছে, সবই পাকিস্তানে ফেলে এসেছি। একেক সময় ভাবি কি বাবা, পেটটাও যদি সেই সাথে রেখে আসতে পারতাম। এত জ্বালা থাকত না।'

সুকুমার চোখ তুলে তাকাল। বুড়ো হবার মত বয়স নয় সুধারানীর, কিন্তু দেহ যেন পাকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে, মাথার সামনের দিকে চুল উঠে উঠে কপালটা রীতিমত বড় দেখায়। দুহাতে দুগাছি শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু হাত দুটি ভারি করিত-কর্মা, সুস্থ থাকে না এক মিনিট। মায়ের পাশে সুধারানীর চেহারা কল্পনা করে অদ্ভুত এক দরদে সুকুমারের মন ভরে উঠল।

চা খেতে খেতে সুকুমার বলল, 'ওর বুঝি ফিরতে দেরি হবে।'

সুধারানী বললেন, 'না বেশী দেরি হবে না, আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে।' তারপর সামান্য একটু হেসে বলল, 'তুমি আসবে জানলে মেয়েকে আমি বেরতে দেই?' বলতে বলতেই কিন্তু সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। আরতির তো এত তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা নয়,

একটু খানেক কান খাড়া করে রইলেন সুধারাণী। তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি একটু বস বাবা, আমি দেখছি, সদরে কে আবার এল। আর বোলো না, রাতদিন কড়া নাড়বে আর আমাকে গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে দোর খুলে দিয়ে আসতে হবে।'

সুকুমার গম্ভীরভাবে বলল, 'খুব লোকজন আসে বুঝি আপনাদের এখানে?

সুধারানী একটু হাসলেন, 'কী যে বল বাবা। সবাই আমাদের এখানে আসবে কেন। আরো ভাড়াটে আছে তো এ বাড়িতে। তাদের ঘরে আসে। কিন্তু সবাই এমন কুঁড়ে, দরজাটা গিয়ে কেউ খুলে দিয়ে আসবে তাই কারো সাধ্যে কুলোয় না।'

বলতে বলতে আরতির মা ঘর থেকে বেরিয়ে সদরের দিকে গেলেন। দোর খুলতেই দেখলেন বিজন দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। কিন্তু চেহারা দেখলে আরো বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দুটি গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে। চোখের কোণে কালি। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। দৈর্ঘের অনুপাতে প্রস্থটা চোখে পড়তেই চায় না।

তাকে দেখে আরতির মা বলে উঠলেন, 'আবার তুমি এসেছ? বলেছি না এ বাড়িতে তুমি আর এস না, তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ নেই।' বিজনের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুটো হঠাৎ রাগে আর উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিজন বলল, 'আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ থাক আর না থাক আমার বয়েই গেল। কিন্তু আরতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে, আলবত আছে। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

সুধারানী বললেন, 'বেশ, সে বোঝাপড়া আরতির সঙ্গেই করো

নিয়ো। আরতি এখন বাড়ি নেই। যখন বাড়ি থাকে তখন এস। এখন যাও।'

সুধারানী দোর বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন বিজন জোর করে দরজার পাল্লা ঠেলে ধরে মুখ বাঁকিয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে বলল, 'অত সহজে আমাকে নাড়াতে পারবে না ঠাকরুন। আমার নাম বিজন বোস। জেলফেরত কয়েদী। একবার কেন সাতবার জেলে যাব আমি। খুন করে ফাঁসি যাব। তবু এর একটা হেস্তনেস্ত না করে আমি এখান থেকে নড়ব না। কোথায় আরতি? তাকে তুমি নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ।'

বিজন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। উঠান পেরিয়ে ঘরে যাওয়ার উপক্রম করতেই চোখে পড়ল আর-একজন কে চুপ করে তক্তপোশের ওপর বসে রয়েছে।

ভিতর থেকে সব কথাই সুকুমারের কানে গিয়েছিল। আগন্তুক যে কে তা বুঝতে তার মোটেই বাকি ছিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে বিজনকে একবার দেখে নিয়ে বলল 'আসুন।'

বিজন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি ডাকলেও আসব, না ডাকলেও আসব। তার আগে একবার শুনতে পারি কি আপনি কে?'

সুকুমার বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন। আমার নাম সুকুমার দত্ত।'

বিজন বলল, 'বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আপনিই বুঝি আরতির এখন হবুবর?'

সুকুমার বলল, 'সে সব কথা পরে হবে। আসুন, ভিতরে এসে বসুন।'

সুধারানী ততক্ষণ এসে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছেন। বিজনের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ হবে না, ওকে চটিয়ে দিলে তার ফল

বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে একথা তিনি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গলার স্বর পালটে তিনি কোমল স্বরে বিজনকে বললেন, 'বিজু, তুমি চল আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসে বস। হাতের কাজ সারতে সারতে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করব। কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা।'

বিজন তাঁর দিকে তাকিয়ে তার ময়লা দাঁতগুলি বের করে হাসল, 'খুব ভয় হয়েছে মনে, না ঠাকরুন? পাছে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিই, পাছে হবু জামাইয়ের কাছে আপনাদের কীর্তি-কলাপ সব ফাঁস করে দিই সেই ভয়? তা ঠাকরুন হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়ে রাখা যায় কিন্তু মানুষের মুখ চেপে রাখা অত সহজ ব্যাপার নয়।'

সুধারানী বুঝতে পারলেন কোন কিছুতেই আর ফল হবে না। নরম গরম যাই তিনি বলুন না বিজনকে তিনি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। ও শত্রুতা করবার জন্য কোমর বেঁধে এসেছে। ও যা বলবার তা বলবেই। তাই শেষ অস্ত্র ছাড়লেন তিনি। মৃদু হেসে তিনি সুকুমারের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'বাবা সুকুমার।'

ভারি মধুর শোনাল তাঁর গলা। সুকুমার ভেবে বিস্মিত হল ওই দড়ির মত পাকানো চেহারার বর্ষীয়সী এই স্ত্রীলোকটির গলায় অমন মিষ্ট ভাষণ ফুটে বেরল কী করে।

'বিজুর কোন কথায় তুমি কান দিও না বাবা। জেল থেকে বের হবার পর ওর মাথার ঠিক নেই। ওকে দেখে অবধি মন আমার অস্থির হয়ে আছে সুকুমার। এমন সোনার চাঁদ ছেলে, তার যদি মাথার গোলমাল হয় বল তো বাবা তার আত্মীয়স্বজনের মনটা কী রকম করে। এখন দরকার ভালো ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করা। কিন্তু কী দিয়ে কী করবে বল। হাতে পাতে যা ছিল সবই তো গেছে।' বিজন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'বটে!' নিজেদের কেলেঙ্কারি ঢাকতে গিয়ে

আমাকে এখন পাগল বানাবার চেষ্টা।’ বিজন আরতির মার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। সুকুমার তার হাত চেপে ধরল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, ‘বসুন, আমি আপনার সব কথা শুনব।’

তারপর সুধারানীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘যান আপনি নিজের কাজে যান। বিজনবাবুর জন্যে ভাববেন না। ওঁকে আমি সামলাচ্ছি।

যাওয়ার আগে সুধারানী কাতরভাবে বলে গেলেন, ‘তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না বাবা।’

সুকুমার ভাবল ওঁর এই কাতরতা কি ভান না এর মধ্যে আন্তরিকতা কিছু আছে। মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে চান, তাই এখন ওঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সব করতে পারেন।

সুধারানী চলে গেলে বিজন বলল, ‘আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আমাকে দেখে কি পাগলের মত মনে হয়?’

সুকুমার বলল, ‘মোটেই না। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ। ও নিয়ে ভাববেন না। আপনি যা বলছিলেন তাই বলুন এবার।’

বিজন বলল, ‘বলবার আর কিছু নেই মশাই। এ বাড়িতে এখন আপনার যা পজিশন তিন বছর আগে আমারও তাই ছিল। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি আপনি এদের ফাঁদে পড়বেন না। এদের মত এমন বেইমান মানুষ আর দুনিয়ায় নেই।

সুকুমার বলল, ‘তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি চেক জাল করে জেলে গিয়েছিলেন সে ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে?’

বিজন বলল, ‘ও, আপনি সে কথা শুনেছেন? সব কথা শোনেন নি মশাই, সব শোনেন নি।’

সুকুমার বলল, ‘সবই তো শুনতে চাইছি। বলুন না।’

সুকুমারের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বিজন। ও

রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। সুকুমার যে ওর জন্য দরদ দেখাবে, ওর সব কথা শুনতে চাইবে এটা অভাবিত। বিজন বরং আশঙ্কা করেছিল হবু শাশুড়ীর পক্ষ নিয়ে সুকুমার আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে আসবে। অবশ্য তাতে বিজন ভয় পেত না, আজ তাহলে দুটোকেই সাবাড় করে রেখে যেত। আজ বিজন মরিয়া হয়ে এসেছে। একটা রক্তারক্তি কাণ্ডই যদি ঘটে তাহলেই বা কী আর এমন হবে। আড়াই বছর জেল খেটে এসেছে, না হয় আবার বছর দুই ঘানি টেনে আসবে। তবু এই শয়তানদের একবার দেখে নেওয়া দরকার। কিন্তু সুকুমারের সুর আলাদা। আর সত্যি তো এমন দরদ দিয়ে ওর কথা কে আর আগে শুনতে চেয়েছে। বাড়িতে বিজন সুখ পায় নি, বন্ধু-বান্ধবেরা টিটকারি দিয়েছে। আর এ-বাড়ির এই দুই শয়তানী—যাদের জন্য জেল পর্যন্ত খেটে এল তারা তো ওকে দেখলেই মুখ ফেরায়। কোন কথা বলতে গেলে পারে তো কানে আঙুল দেয়। বিজন তক্তপোশের উপর সুকুমারের পাশে উঠে বসল, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় কপাল মুছে নিল। তারপর পকেট হাতড়ে বিড়ি-দেশলাই বার করল। সুকুমার তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন সিগারেট খাওয়া যায়।'

সিগারেট ধরিয়ে বিজন শুরু করল।

'সব কথা শুনতে চাইছেন, কিন্তু সব কথা যদি শোনেন তাহলে আপনারও মাথা গরম হয়ে উঠবে। এরা যে কত বড় শয়তানের জাত সেটা এতদিনে টের পেয়েছি। আর' বিজন একটু কাল থেমে থেকে ফের বলল, 'আর আপনিও একদিন টের পাবেন।'

বাধা দিয়ে সুকুমার বলল, 'আমার কথা বাদ দিন, ওদের কথা কী বলছিলেন বলুন।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বিজন বলল, 'কিন্তু সে-সব কথা কি আপনার শুনতে ভালো লাগবে? লাগবে না। আমারও এক সময় লাগত না। বন্ধু-বান্ধব কি কম সাবধান করেছে। কিন্তু তখন ভেবেছি সেটা ওদের হিংসে ছাড়া কিছু নয়। এখন সব বুঝতে পারছি। পাগল! এখন আমি তোদের কাছে পাগল ছাড়া কী?' বিজন ফের উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কী রকম পাগল আমিও তা দেখিয়ে ছাড়ব। মেয়েছেলে বলে পার পাবে ভেবেছ। তা হবে না। তোদের মত দু-একটাকে খুন করে ফাঁসি যাওয়ার হিম্মত বিজন বোসের আছে। পাগল!' নিজের মনেই বিজন একটু হাসল, 'মার কাছে আজ আমি পাগল, আর মেয়ের কাছে? মেয়ের কাছে বোধ হয় পাগলেরও অধম কিছু। অথচ আরতির জন্য আমি কী না করেছি।'

সুকুমার প্রশ্ন করল, 'আরতির সঙ্গে আপনার প্রথমে আলাপ হল কী করে? আপনি তো এ পাড়ায় থাকেন না।'

বিজন বলল, 'না তা থাকি না। আমার বোন উর্মিলা আর আরতি কিছুদিন এক স্কুলে পড়েছিল। সেই সুযোগে উর্মিলা মাঝে মাঝে আসত এ-বাড়িতে। আরতি তাকে ধরল চাকরির জন্য। উর্মিলা সুপারিশ করল আমার কাছে। কিন্তু এ বাজারে চাকরি জোটানো কি সোজা ব্যাপার! নিজেরই তো তখন এক লাটের চাকরি। ছোট ব্যাঙ্কের পাসিং অফিসার। অফিসার কেবল নামে—মাইনে আশি টাকা, অ্যালাউন্স নিয়ে একশ। বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছে বললাম, কিন্তু ভরসা পেলাম না। ওকে নিয়ে এ-অফিসে ও-অফিসে নিজেই কি কম ঘুরেছি। কিন্তু কিছু হল না। দু-একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে অবশ্য চান্স পাওয়া গেছল। কিন্তু সে-সব চাকরির অর্থ তো আমার জানতে বাকি নেই। সে-সব জায়গায় প্রাণ ধরিয়ে ওকে দেই কি করে। কিন্তু এখন ভাবি'

বিজন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর বলল, 'এখন ভাবি তখন অমন করে ওকে ঠেকিয়ে না রাখলে আজ আমার ভাগ্য অন্যরকম হত। যা খুশি করত, যেখানে খুশি গিয়ে মরত, আমার তাতে কী। যাকগে শুনুন তারপর। ভেবে দেখলাম এভাবে হবে না, কোয়ালিফিকেশন না বাড়াতে পারলে ভদ্র রকমের চাকরি জোটানো যাবে না। ভেবেচিন্তে দিলাম ওকে জর্জ টেলিগ্রাফিতে ভর্তি করে। ও যে টাইপ শিখল সে কার টাকায়? মাসের পর মাস টিফিন করি নি। প্রাণ ধরে একটা সিগারেট কিনে খাইনি। বরাবর ওর মাইনে জুগিয়ে গেছি। এত করেও শর্টহ্যাণ্ডটা আর হল না। না হলেও কয়েক মাস পরে টাইপ-রাইটিংটা মোটামুটি শিখল। ভাবলাম এবার একটা ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু ভাবলাম এক হল আর। আরতি অসুখে পড়ল। টাইফয়েড। অফিস ছুটির পর রোজ এসেছি। খালি হাতে নয়। কোনদিন লেবু এনেছি, কোনদিন বেদানা। তখন এই সুধা-ঠাকরুনের কত আদর, কত তোয়াজ, মাটি দিয়ে হেঁটে গেলে যেন গায়ে ব্যথা পেতেন, যাওয়ার সময় রাস্তা পর্যন্ত পিছনে পিছনে এগিয়ে বলতেন, 'তুমি তো আমাকে কিনে রাখলে বিজন।' কিন্তু কিনে রাখব এমন পয়সার জোর আমার কোথায়! এদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার মুরোদ কই আমার। কিন্তু আমার মাথায় তখন ভূত চেপে গেছে। ধারকর্জ শুরু করে দিয়েছি। শুধু ওষুধ ডাক্তারই তো নয়, এদের বাজার আছে, রেশন আছে, ঘরভাড়া জমে রয়েছে, সেই দেনা মেটাতে দিলাম একদিন রিস্টওয়াচটা বেচে। মিথ্যা বলব না। আরতি খালি হাত দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঘড়িটা কেন বেচতে গেলে? বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ছে, না হয় বাড়িওয়ালা কেস করত। অন্তত ছমাস তো সময় পাওয়া যেত।'

হেসে বললাম, ‘আর সময় দিয়ে কাজ নেই, তুমি এবার ভালো হয়ে ওঠ দেখি। ঘড়িটড়ি সব পাওয়া যাবে।’ তখন কি আর জানি যে ওর সবটুকুই ছলনা। কিন্তু ঐ যে বললাম, তখন আমার কাঁধে ভূত চেপে রয়েছে। তা নাহলে আশ্চর্য, ভবরঞ্জনের কথা ওরা আমাকে যা বোঝাল আমিও তাই বুঝলাম! একদিন বিকেলে এসে দেখি ঠিক আজ আপনি যেখানে বসে আছেন সেইখানে বুড়ো এক ভদ্রলোক। ভবরঞ্জন বুড়ো হলে হবে কি, ওর হাবভাব আমার ভালো লাগল না। আরতির একেবারে বিছানায় এসে বসেছে। মাথায় হাত বুলোচ্ছে আস্তে আস্তে। আরতির মা ঘরে নেই। শুধু ওরা দুজন।

আমাকে ঢুকতে দেখে ভবরঞ্জন আর দেরি করল না। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। আরতিকেই জিজ্ঞেস করলাম, জানতে চাইলাম লোকটা কে। আরতি হেসে বলল, ‘পাতানো দাদু’। কিন্তু আরতি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে হবে কী, আমার মধ্যে একটা খটকা লেগে রইল। ভবরঞ্জন শুধু হাতে আসে নি। আরতির মাথার কাছে দেখলাম বড় একটা ডাব। মুখ কেটে বাটি ঢাকা দেওয়া। বুঝলাম ভবরঞ্জনের পয়সায় কেনা। আরতির মাকে আড়ালে ডেকে বললাম, ‘এসব আমি পছন্দ করিনে।’ তিনি বললেন, ‘কি জানি বাবা, বুড়ো মানুষ ভালোবেসে দুটা ফল দেবে, শখ করে একটা জিনিস কিনে দেবে, এর মধ্যে দোষের কী আছে।’

বললাম, ‘কেন, ফল আমি কিনে দিতে পারি না।’

তিনি বললেন, ‘পারই তো, তুমিই তো দিচ্ছ। কিন্তু ফল আর ওষুধ ছাড়াও তো খরচ আছে সংসারে।’

বললাম, ‘সে খরচ আমি চালাচ্ছি না?’

আরতির মা বললেন, ‘হ্যাঁ তাও চালাচ্ছ। কিন্তু তুমিই বা আর কতদিন চালাবে?’

রাগ করে বললাম, 'পারি না পারি আমি বুঝব। ভবরঞ্জন যেন কাল থেকে এ বাড়িতে আর না আসে।'

তার পরদিনও ভবরঞ্জন একবার এসেছিল। কিন্তু আরতির মা পাকা হিসেবী। ওঁর হিসেবে ভুল হবার নয়। ভবরঞ্জনের চেয়ে আমার মধ্যে সেদিন উনি বেশি শাঁস দেখেছিলেন। ভবরঞ্জনকে তো তাড়ালাম। কিন্তু আমি তখন প্রায় ফতুর হয়ে গেছি। আরতির জ্বর ছেড়ে গেল কিন্তু ওর চেহারার দিকে চাইলে আমার চোখ ফেটে জল আসত। অসুখ থেকে উঠে ও একটু দুধ খাবে না, একটু ভালো মাছ খাবে না, একথা মনে পড়লে আমি সব ভুলে যেতাম।'

সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটাকে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বিজন আবার একটু চুপ করে রইল। সুকুমার দেখল ওর মুখ-চোখের চেহারা কেমন করুণ হয়ে উঠেছে। একটু আগে যে মানুষটি বীর বিক্রম দেখাচ্ছিল এ যেন সে নয়; আর কেউ।

বিজন আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'অর্ধেক বখরায় যেদিন জাল চেক পাশ করে দিলাম সেদিন আমার তিনবার হাত কাঁপল। কিন্তু মনকে বোঝালাম তুমি যা করছ এ তো নিজের জন্য নয়, তোমার আরতির জন্য। কতজনে কতরকম করেছে, আর তুমি এটুকু পারবে না। পেরেছিলাম, কিন্তু শেষরক্ষা হল না, ধরা পড়ে গেলাম। সাজা হল আড়াই বছর। তাতেও আমি ভয় পাই নি। আড়াই বছর একটা মানুষের জীবনে কী? কিন্তু বেরিয়ে এসে যা শুনলাম আর দেখলাম তাতে একেবারে পাগল হয়ে বেরিয়ে এলেই বোধ হয় সুবিধে হত, আরতির মা মিথ্যা বলে নি!'

পা টিপে-টিপে এসে সুধারানী এক-একবার ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন আরতি আসবার আগে বিজনকে বিদায় করতে পারলে হত; কিন্তু আরতি ততক্ষণে এসে পড়েছে।

'বিজুদা।'

পিছনে একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠের শব্দে বিজন আর সুকুমার দুজনেই চমকে উঠে ফিরে তাকাল। আরতি দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রোধে তার দুটি চোখ জলজল করছে। পাতলা আরক্ত ঠোঁট দুটি এক দৃঢ় সঙ্কল্পে সংবদ্ধ। বিজন তার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ঘাবড়ে গেল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আরতি! কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

আরতি বলল, 'সে খবরে তো তোমার দরকার নেই। তুমি কেন এখানে এসেছ তাই শুনি। কেন এসেছ?'

বিজন মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'কেন এসেছি? এসেছি তোমার কাছে, এসেছি তোমার জন্যে।'

ঘরের মধ্যে সুকুমার বসে। একটু দূরে সুধারানীও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সকলের সমক্ষে বিজনের এই স্পষ্ট প্রণয়নিবেদন শুনে আরতির মত মেয়েও লজ্জা পেল। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আমাদের এখানে আসবার তো তোমার আর কোন দরকার নেই।'

বিজন বলল, 'তোমার দরকার না থাকতে পারে। কিন্তু আমার এখন যথেষ্ট দরকার আছে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে আরতি।'

আরতি ঘরের মধ্যে ঢুকল। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'কিন্তু কোন কথা শোনার সময় আমার এখন নেই। তুমি যাও, এখনই যাও।'

বিজন তেমনি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'যদি না যাই।'

আরতি বলল, 'তাহলে অপমান করে বার করে দেব।'

সুকুমার অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তার চেয়ে আমিই বরং যাই আরতি।'

আরতি একটু হাসল, 'সে কি, সব কথা না শুনেই যাবে? এখনো তো অনেক বাকি।'

সুকুমার শান্তভাবে বলল, 'যা বাকি আছে তা বাকিই থাক আরতি। ওসব শোনার আমার আর কোন কৌতূহল নেই।'

আরতি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'সে কি কথা। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে তোমার তো অনেক কৌতূহল ছিল বলে জানতাম। এত অল্পেই তা মিটে গেল?' তারপর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল আরতি। বিজনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই জেলফেরত জালিয়াত দাগী আসামীটার কথা তুমি বুঝি বিশ্বাস করেছ? ও আমার নামে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে আমি ফের জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।'

সুকুমার শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন আরতি?'

আরতি প্রতিবাদ করে উঠল, 'উত্তেজিত হব না? মিথ্যে বদনাম শুনলে—'

বিজন উত্তেজিত ভঙ্গিতে সোজা উঠে দাঁড়াল, মনে হল এবার বুঝি সে আরতিকে সরাসরি আক্রমণ করে বসবে। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল আরতি। কিন্তু বিজন আর এগোল না। একটুকাল স্থির-দৃষ্টিতে আরতির দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'মিথ্যে। আমার কোন কথাটা মিথ্যে আরতি তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল তো। তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে সেই জন্যেই কি চেক জালের ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিই নি? চেষ্টা-চরিত্র করে কিছুতেই যখন চাকরি জোগাড় করতে পারলাম না, ব্যবসা করব বলে যাতে হাত দিলাম তাই ভরা-ডুবি হল, তখন বাঁচবার জন্যে ওদের দলে ভিড়ে পড়া ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিল বল। কিন্তু আমি একা বাঁচতে চাই নি আরতি, তোমাকে

নিয়ে ঘরসংসারের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছি।' আরতি কী যেন বলবার চেষ্টা করল কিন্তু ওর মত প্রগলভা মুখরা মেয়ের মুখেও এই মুহূর্তে হঠাৎ কোন কথা বেরল না।

বিজন বলতে লাগল, 'তারপর দলের লোকের বাড়াবাড়িতে শেষ পর্যন্ত সাজা হয়ে গেল। আমাদের জেল হল। জেলের মধ্যে পশুর মত খেটেছি আর দিন গুনেছি কবে বেরব, বেরিয়ে এসে কবে তোমাকে দেখতে পাব। আজ আমার সব সাধ মিটেছে। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র পুরুষের নাগাল পেয়েছ। বেশ সেই ভালো, তুমি সুখী হও আরতি। আমার আর কোন জায়গা না থাকে জেলখানার দুয়ার খোলা আছে। সেখানে আমার আদরযত্নের অভাব হবে না।'

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বিজন ঘর থেকে বেরোল। উঠোন ডিঙিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে নামল এসে রাস্তায়। কেউ তাকে বাধা দিল না, কেউ তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করল না। একটু বাদে সুধারানী বললেন, 'বাঁচা গেল, বাবারে বাবা, আস্ত একটি বাটপাড়।'

আরতি কি সুকুমার কেউ কোন কথা বলল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, 'আমি এবার যাই আরতি।'

সুধারানী বললেন, 'এসো বাবা, আবার এসো। ঐ বদমাশ বাটপাড়টা যা বলে গেল তার একবিন্দুও সত্য নয় বাবা। তুমি ওর কথার এক বিন্দুও বিশ্বাস কোরো না।'

সুকুমার একটু ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল।

দিন তিনেক বাদে একখানা চিঠি এল সুকুমারের নামে। নীলাভ রঙের খাম, ওপরে গোট-গোট অক্ষরে মেয়েলী হাতে নামঠিকানা লেখা।

বাড়ির সবার চোখ এড়িয়ে ছাদের কোণে নিরালায় গিয়ে সুকুমার খুলে ফেলল চিঠিখানা। আরতি লিখেছে—'বিজনের একটি বর্ণও বিশ্বাস না করবার জন্য মা তোমাকে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু আমি তোমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ করতে যাব না। আমি তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝেছি তুমি ওর সব কথা বিশ্বাস করেছ, প্রতিবর্ণ বিশ্বাস করেছ। বিজন অবশ্য অতখানি সত্যবাদী নয়, কিন্তু ও যা বলেছে, বলতে চেয়েছে, তার আসল কথাটা তো সত্যি। হ্যাঁ একথা সত্যি ও আমার জন্যেই জেলে গিয়েছিল। যেমন করে পারুক আমি ওকে টাকা যোগাড় করে দিতে বলেছিলাম। তবে চুরি-জোচ্চোরি করে জেলে যেতে বলি নি। তাই জেলে যখন গেল, আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল, ওর বোকামির জন্যে রাগ হতে লাগল। দুঃখ হল কিন্তু সেই দুঃখ নিয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকব তেমন সময় কই, সাধ্য কই। পেটের দায়ে বাইরে বেরোতেই হল। ভাবলুম যেটুকু বিদ্যে-বুদ্ধি আছে তার জোরে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে সৎভাবে থাকতে পারব, ওর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব। কিন্তু সব সময় আমরা যা ভাবি তাই কি হয়! আমার বেলায়ও হল না। চাকরি অনেক কষ্টে জুটল। দিন কয়েক বাদেই বুঝতে পারলাম সেই কষ্টের চাকরি টিকিয়ে রাখার পক্ষে আমার সামান্য বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই নয়। আরও অনেক কিছু দরকার। কিছু কিছু করে দিতে দিতে সব দিলাম। ভাসতে ভাসতে চললাম, সেই ঘোলা পঙ্কের জলের স্রোতে সব ডুবে গেল। কে জেলে গিয়েছে, কে কার জন্যে অপেক্ষা করছে কিছুই মনে রইল না।

তারপরে এলে তুমি। এলে ঠিক নয়, শীলার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিলাম। এমন অনেক জনকেই তো কেড়েছি আবার দুদিন বাদে ছুঁড়ে ফেলেও দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে ফেলে দিতে মন সরল না।

তুমি যে আমার সাত রাজার ধন মানিক। ভাবলাম, আর নয়, এবার তোমার হাত ধরে নতুন ঘরে ঢুকব। মণির আলোয় আমার সব কালো দূর হবেই। এখন আর আমার ভয় কিসের। কিন্তু আমি ভাবি এক, হয় আর। জেলের পুরনো চোর ছাড়া পেয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। কুৎসা আর কলঙ্কের কিছু আর বাকি রইল না। ভাবলাম, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। বলব ওসব তুমি গ্রাহ্য কোরো না। তোমায় ছোঁয়ায় আমার সব কলঙ্ক দূর হবে। কিন্তু আরেকজনে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। হ্যাঁ, ঐ বিজন। সেই নির্লজ্জ জালিয়াত কালও এসেছিল। সে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঘরের মধ্যে টেনে না নাও, জেল ছাড়া আমার আর যাওয়ার জায়গা থাকবে না। কিন্তু জেলে যেতে চাইনে আরতি, সত্যি আর যেতে চাইনে।

তুমিই বল, এরপর কি আর তাকে যেতে দেওয়া যায়। ও বলছে, আমাকে তুলে নাও। ও জানে আমিও পড়ে গেছি, তা সত্ত্বেও বলছে। জানি না উঠতে পারব কিনা। কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারব। তোমার আশীর্বাদ চাই।'

বার দুই চিঠিখানা পড়ল সুকুমার, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বিজনের কাহিনী জানবার পর থেকে তার মন কেবলই দ্বিধায় দুলছিল, কী করা উচিত। এখন আর কোন দ্বিধা সংশয় নেই। কর্তব্যের পথ আরতি দেখিয়ে দিয়েছে। গ্রন্থি জটিল হয়ে উঠেছিল, তা আরতিই ছিন্ন করে দিয়েছে আজ। এ একরকম ভালোই হয়েছে। সমস্ত দায়িত্ব থেকে, চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে আরতি। ওর চিঠির কথাগুলি সুকুমারের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যি,

আরতির মত মেয়ের কাছ থেকে এ ধরনের চিঠি যেন অভাবিত। ওর মত মেয়ের মধ্যে যে কোন গভীরতা থাকতে পারে, আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা কিছু থাকতে পারে তা স্থকুমার যেন ভাবতেই পারেনি। এ সব কিছুর প্রত্যাশা না রেখেই যেন সে আরতির ওপর আকৃষ্ট হয়েছিল।

ভেবেছিল, ওর বাইরের চাকচিক্য, বেশবাসের ঔজ্জ্বল্য, কথাবার্তার চাতুর্যই যথেষ্ট। ওর যেন কোন লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, ও যে পুরনো রীতিনীতি সংস্কারের ধার ধারে না এই অভিনবত্বেই সে মুগ্ধ, আর কিছু সে পেতেও চায় না, দিতেও চায় না; কিন্তু আরতির চিঠিতে এক অনাস্বাদিত বিদায়বেদনার আভাস পেয়ে স্থকুমারের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনে হল এই মুহূর্তে সত্যিই যেন আরতিকে সে ভালোবেসেছে। এ ভালোবাসায় মত্ততা নেই, এ ভালোবাসায় ত্যাগ আর গ্রহণের অর্থ পালটে দেয়, তাদের সীমা বিস্তৃত করে। স্থকুমারের যোগ্যতা শ্রেষ্ঠতা বারবার স্বীকার করেও আরতি যে অযোগ্য বিজনকে গ্রহণ করেছে এতে যেন স্থকুমারের ভাবরূপকেই আত্মসাৎ করেছে আরতি। তাই এ পরাজয়ে গ্লানি নেই, প্রত্যাখ্যানে লজ্জা নেই স্থকুমারের। মুক্তি পেয়েছে স্থকুমার, কিন্তু মুক্তির মধ্যে কিসের যেন একটা শূন্যতা আছে। সেই শূন্যতাবোধে স্থকুমারের সমস্ত মন ছেয়ে গেল। যেন কিছু করবার নেই, যেন কিছু ভাববার নেই; সব শেষ হয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে মনের সেই শূন্য পটে আরেকটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল। আর এতদিন পরে নিজের ব্যবহারের কথা মনে করে স্থকুমারের মন লজ্জায় অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সত্যি শীলাকে সে যে রূঢ় আঘাত দিয়েছে, যে মারাত্মক দুর্ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, তার যেন সঙ্গত কারণ ছিল না, প্রয়োজন ছিল না। কেমন এক ধরনের আক্রোশ আর

জেদে পেয়ে বসেছিল সুকুমারকে। শীলাকে আঘাত দিতে হবে, তাকে জব্দ করতে হবে। সেই জেদই তাকে টেনে নিয়েছে আরতির কাছে, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

একবার সুকুমারের ইচ্ছে হল শীলার কাছে সব খুলে বলে, খুলে বলে, আমি তোমার প্রীতি চাইনে, প্রণয় চাইনে, শুধু বিশ্বাসটুকু চাই। বিশ্বাস কর, আমি আর কাউকে চাইনি, আর কাউকে ভালো বাসিনি, শুধু আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ দিয়ে বারবার তোমাকেই চেয়েছি।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেই সুকুমার ধমক দিল, ছিঃ হৃদয়ের এ কি কাঙালপনা, সে না পুরুষ! ভালোবাসার অভাবে শুকিয়ে মরে গেলেও সে কোন মেয়ের কাছে নতজানু হতে পারে না। কী হবে হাত পেতে? যা গেছে তা কি আর ফিরে পাওয়া যায়? ভিক্ষা করলে করুণা মেলে, অনুকম্পা মেলে কিন্তু নারীর ভালোবাসা ভিক্ষায় মেলে না।

দিন দুই অন্যমনস্কের মত কাটাল সুকুমার। আফিসে যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ কাজই পেণ্ডিং পড়ে থাকে, বাড়িতে এসে কারো সঙ্গে কথা বলে না, চুপচাপ বই নিয়ে বসে, কিন্তু বইয়ের পাতা নাড়ে না।

বিমলপ্রভা ছেলের ভাবগতিক লক্ষ্য করে একদিন বললেন, ‘তোর কী হয়েছে রে সুকু?’

সুকুমার বলল, ‘কিছু হয় নি মা।’

বিমলপ্রভা বললেন, ‘কিছু হয় নি, না? দেখ সুকু, আমার কাছে কিছু লুকোস না। চেষ্টা করেও লুকোতে পারবি না, আমি তোর মা। আমি সব টের পাই।’

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘বেশ, তোর যদি ইচ্ছে হয়, তুই সেই আরতিকেই বিয়ে কর। আমি বাধা দেব না, তোর

পছন্দেই আমার পছন্দ, তোর সুখেই আমার সুখ। যার দুঃখের কথা ভেবে বলেছিলাম, সেই যখন নিজের পথ বেছে নিয়েছে—'

বলে বিমলপ্রভা হঠাৎ থেমে গেলেন।

সুকুমার বলল, 'থামলে কেন মা, বল।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'শীলার সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গেছে। বারাকপুরের কোন এক উকিলের সঙ্গে। শীলাদের পাড়ার একটি ছেলের কাছে সব শুনলাম। যা ভেবেছিলাম তা তো হল না, তবু আশীর্বাদ করি, মেয়েটা সুখী হোক! মেয়েটি সত্যি বড় ভালো ছিল রে।'

সুকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর উঠে গেল সেখান থেকে।

আরও দিন তিনেক বাদে অফিস থেকে ফিরে এসে বলল, 'মা, আমি একমাসের ছুটি পেয়েছি, ভেবেছি, বাইরে থেকে একটু ঘুরেটুরে আসব।'

বিমলপ্রভা বললেন, 'ওমা সেকি কথা, আমি তো কর্তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করেছি। ছুটি যখন নিয়েছ বাপু, বিয়েটা এ মাসেই সেরে ফেল।'

সুকুমার অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'বিয়ে সারবার আর উপায় নেই মা, কনে হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

বিমলপ্রভা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওমা সে কি কথা!'

সুকুমার মাকে সব কথা খুলে বলল।

বিমলপ্রভা কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, 'এতদিন আরতির হালচালের কথা শুনে তাকে ঘৃণাই করেছি সুকুমার। আজ কিন্তু আর ঘৃণা হচ্ছে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।' একটু বাদে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করিস একটা কথা বলি।'

সুকুমার বলল, 'কী কথা।'

বিমলপ্রভা ইতস্তত করে বললেন, 'ভাবছি, শীলাকে খবরটা দিলে কেমন হয়? এখনও তো ওর বিয়ে হয় নি।'

সুকুমার বলল, 'ছিঃ মা ছিঃ, একথা তুমি কি করে ভাবতে পারলে, দাঁতে কুটো নিয়ে আমি যাব তার কাছে অপরাধ স্বীকার করতে। পরাজয়ের কাহিনী বলে তার অনুকম্পা কুড়াতে। কক্ষনো নয়। কক্ষনো নয়। তার চেয়ে সে যা করতে চাচ্ছে করুক, করে সুখী হোক।'

বিমলপ্রভা আস্তে আস্তে বললেন, 'তবে থাক।'

পরদিন ভোরের গাড়িতেই পশ্চিমে যাবে সুকুমার। সুটকেশ গুছিয়ে আর হোল্ডঅলের মধ্যে বিছানা ভরে যাত্রার জন্যে সে একেবারে তৈরী, কিন্তু যাত্রার ব্যাঘাত ঘটল। দলবেঁধে পাড়ার ছেলেরা এসে হাজির। তারা সেই পুরনো লাইব্রেরিটাকে এবার দাঁড় করাবে। তার জন্য কিছু টাকা তুলবার ব্যবস্থা করেছে তারা, একটা ভ্যারাইটি শোয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাইরে থেকে কয়েকজন প্রখ্যাত গায়ক গায়িকা আসতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রোগ্রাম পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়েই করানো হবে। বনমালী বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারি একদিনের জন্য স্কুল বিল্ডিংটা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন, এবার দরকার একজন পরিচালকের। সে ভার সুকুমারকে নিতেই হবে। এর আগে ছেলেরা কয়েকদিন দেখা করতে এসে ফিরে গেছে। কিন্তু আজ যখন একবার দেখা পেয়েছে কিছুতেই আর সুকুমার ছাড়া পাবে না।

সুকুমার বলল, 'কিন্তু আমি যে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছি।' দলের পাণ্ডা নির্মল মুখুজ্জে বলল, 'হলেনই বা। এক সপ্তাহ বাদে যাবেন। তখন আমরা এসে আপনার বাক্স-বিছানা ফের বেঁধে দিয়ে যাব।'

সুকুমার কী একটু চিন্তা করে 'বলল, আচ্ছা, কিন্তু আমাকে দিয়ে কি সত্যি তোমাদের কোন কাজ হবে?'

নির্মল বলল, 'নিশ্চয়ই হবে নিশ্চয়ই হবে, আমরা আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেব, সুকুমারদা। আপনি অনেক ফাঁকি দিয়েছেন, আজ আর আমরা আপনাকে ছাড়ছিনে।'

সুকুমার ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। মনে মনে ভাবল, এই ভালো। পালাবার সবচেয়ে ভালো জায়গা অরণ্য নয়, জনারণ্য; যদি ডুবতে চাও, কাজের সাগরে ডুব দাও। সব দৈন্য সব গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাবে।

বিয়ের ব্যাপারে দাদার সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে না পেরে শীলা সেদিন বলেছিল, কর যা তোমাদের খুশি। কিন্তু সেই সামান্য একটা মুখের কথাকে ধরে নিয়ে অজিত যে এতটা এগিয়ে যাবে শীলা তা ভাবতে পারে নি। জিতেন দাসকে অজিত নিমন্ত্রণ করে এসেছে, সে আজ আসছে মেয়ে দেখতে। আগে থেকে শীলা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারে নি। আশ্চর্য! এত জোর কোথায় পেল অজিত, কোথায় পেল শীলার ওপর এই জুলুম চালাবার অধিকার। দাদাকে সে ভালোবাসে, দাদার মনে আঘাত দিতে ভয় পায়, ওর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই কি অজিত এতটা এগিয়ে গেছে। শীলা বড় হয়েছে, ওর একটা স্বাধীন মতামত আছে, কিন্তু অজিত সেজন্যে অপেক্ষা করে নি, যে জিতেন দাস সম্বন্ধে শীলা কিছুই জানে না, সেই অজানা অচেনা মানুষটি যদি তাকে দেখে পছন্দ করে যায় তা হলেই তাকে বিয়ে করতে হবে! অবশ্য শীলার কাছে জিতেন দাস এখন আর মোটেই অচেনা নয়। অজিত ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেকদিন বলেছে, ব্যারাকপুরে থাকলে হবে কি, জিতেন ওর আগে থেকেই চেনা, গ্রামে

থাকতে একই স্কুলে দুজনে কিছুদিন পড়েছে। সেই সুবাদে সতীর্থ, বন্ধুও বলা যায়। কিন্তু শীলার কাছে সেইটুকুই কি সব? না, এমন করে অন্যের ইচ্ছার কাঠগড়ায় নিজেকে শীলা ছেড়ে দিতে পারবে না। শীলা জানে এখন অমত করতে গেলেই ওর এই বিমুখতার একটিমাত্র ব্যাখ্যায়ই সকলে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। বলবে ওর এ দুর্বলতা সুকুমারের জন্য, সুকুমারকে শীলা ভুলতে পারে নি। কিন্তু শীলা তো জানে, সুকুমারের সঙ্গে সব সম্পর্ক তার শেষ হয়ে গেছে। আরতির মোহ সুকুমারের কোনদিনই ঘুচবে না। ঘুচুক না ঘুচুক শীলার তাতে কিছু এসে যায় না, তার অন্য পথ আছে, আছে অন্য জগৎ। বিয়ে-থা না করে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে, সুকুমারের প্রেমকে শীলা এতখানি মর্যাদা দিতে রাজি নয়। তাই বলে যা হবার হোক বলে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে তাও শীলা পারবে না। সুকুমারের কাছে সেও একধরনের পরাজয়। জিতেনের আসাকে উপলক্ষ করে অজিত আজ অফিস কামাই করেছে, জ্যোৎস্নাকে দিয়ে ঘরবাড়ি সমস্ত দিন ঝাড়া-পোঁছা করেছে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে চেপে বসে সিগারেট ধরিয়েছে। শীলা আস্তে আস্তে এসে সামনে দাঁড়াল। কোনরকম ভূমিকা না করে বলল, 'জিতেনবাবুকে তুমি বারণ করে দিও দাদা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না।'

অজিত একমুহূর্ত বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শীলা আশঙ্কা করছিল ওর কথা শুনে অজিত হয়তো রাগ করবে, বিরক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু অজিতের মুখে তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না বরং সস্নেহে ওর হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'বিয়ে করবি না তো কী করবি?'

শীলা বলল, 'করব না তো বলি নি। কিন্তু আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও, আরও কিছুদিন ভাবতে দাও দাদা।'

শীলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে অজিত বলল, 'তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দে দেখি।'

মুখ নীচু করে দৃঢ় গলায় শীলা বলল, 'তা পারব না দাদা, আমার ভাবনা, আমাকে তোমরা কিছুটা ভাবতে দাও।'

হাত ছেড়ে দিয়ে অজিত বলল, 'ওঃ তুই এখন বড় হয়েছিস, স্বাধীন হয়েছিস। নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে শিখেছিস। কিন্তু যত বড়ই হোস, দাদার ওপর এ বিশ্বাস রাখিস যে দাদা যা করবে সে তোর ভালোর জন্যেই, সংসারের ভালোর জন্যেই। তাতে তোদের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। কতখানি বড় হয়েছিস তুই। দেখি তাকা দেখি আমার মুখের দিকে।' অজিতের মুখের দিকে শীলা তাকাতে পারল না। এটুকু তার বুঝতে বাকি রইল না যে অজিতকে তার সঙ্কল্প থেকে আপোসে ফিরানো যাবে না। কিন্তু দাদার এই উৎসাহকেই বা ও মেনে নেবে কী করে!

রান্নাঘরে বসে জ্যোৎস্না ময়দা মাখছিল। শীলাকে দেখে বলল, 'বেশ যা হোক। কাজকর্ম সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। তবু তো দিন-তারিখ এখনও ঠিক হয় নি। তা হলে এঘরে তোমার আর ভাই দেখাও পাওয়া যাবে না। বিয়ে কিন্তু ভাই আমাদেরও একদিন হয়েছিল।' তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আবার তুমি সেই কালো কাপড়টা পড়েছ ঠাকুরঝি? দোহাই তোমার, আজকের দিনটা অন্তত তোমার ঐ মলিন বসনটাকে রেহাই দাও। হুট করে কখন ওরা এসে উঠবে, ঐ কাপড়েই হয়তো দেখে ফেলবে। অবশ্য জিতেনবাবুর জন্যে ভাবি না, তোমার ঐ চাঁদমুখের দিকে একবার তাকালে তার নজর কি অন্য কোন দিকে নড়তে চাইবে।'

একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে জ্যোৎস্নার পাশে বসে পড়ে শীলা বলল, 'চাঁদমুখ কি এ বাড়িতে একখানা! আরও একখানা আছে, কার নজর কোথায় আটকাবে কে জানে।'

স্নিগ্ধ হেসে জ্যোৎস্না বলল, 'না ভাই সে ভয় নেই, আমাদের কি আর সে বয়স আছে। আমরা তো এখন বুড়ির কোঠায়। জিতেনবাবুর নজর ঠিক জায়গাতেই আটকাবে, সেজন্য ভেব না।'

পাঁচটা বাজতে না বাজতেই জিতেন এসে হাজির হল। জিতেন একাই এসেছে। অজিত অবশ্য বলেছিল, বন্ধুবান্ধব যাকে খুশি, যে কজন খুশি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে জিতেন। কিন্তু সে রাজী হয় নি। দলবল নিয়ে মেয়ে দেখতে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা আছে। চা জলখাবার পর্ব শেষ হলে আয়োজন হল মেয়ে দেখার। অত্যন্ত শালীন স্বভাব জিতেনের। শীলার নামটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই জানতে চাইল না জিতেন। আগে থেকে যেখানে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, পাকা হয়ে গেছে কথাবার্তা, সেক্ষেত্রে নতুন করে জানবার আর কী আছে? বাকি শুধু চোখের দেখা, দেখে মত দেওয়া—হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। জিতেনের মুখ থেকে শুধু সেই একটি কথা শুনবার প্রত্যাশায় তিনখানা মুখ শঙ্কিত হয়ে আছে। লোকজনের ভিড় কম দেখে নিরুপমা একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। জিতেনকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ওর এখন যে চুল দেখছ বাবা, ও কিন্তু ওর আসল চুল নয়। কোমর ছাড়িয়ে পড়ত মেয়ের চুল। একমাস জ্বরে ভুগে সে চুল সব উঠে গেল। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে চুলে ফের মাথা ভরে উঠেছে।'

শীলা ভাবল মায়ের এই ওকালতির কোন প্রয়োজন ছিল না। আড়চোখে তাকিয়েই শীলা বুঝতে পেরেছে, জিতেনের চোখ আর ফেরবার নয়। জ্যোৎস্না মিথ্যা বলে নি। এই দৃষ্টি আরও একটি

পুরুষের চোখে দেখেছিল শীলা। তার ভুল হবার নয়। কিন্তু জিতেন দাসকে তো ফিরাতেই হবে! এই শান্ত শিষ্ট ঈষৎ স্থূল লোকটিকে কী কথা বলে নিবৃত্ত করবে শীলা। তবু তাকে ফিরাতেই হবে, আজই। আজ আর কোন আপোস নয়, কারো সাথেই নয়।

হঠাৎ সুকুমারের কথা মনে পড়ায়ই কি এত জোর পেল শীলা? এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারল!

শীলাদের বাসা থেকে বাসরুট বেশ খানিকটা দূরে। কিছুদূর পর্যন্ত জিতেনকে এগিয়ে দিয়ে অজিত বিদায় নিল। আর পিছনে তাকিয়ে জিতেন অবাক হয়ে দেখল, অজিত যেখান থেকে বিদায় নিয়েছে প্রায় সেখান থেকেই পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে শীলা। হয়তো আগে থেকেই গলির মুখে এসে অপেক্ষা করছিল। বাড়ির সবাইর অজান্তে কী বলতে চায় মেয়েটি?

জিতেন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে বলবেন কিছু?'

শীলা বলল, 'একটা কথা বলব, কিন্তু সে কথা আপনি দয়া করে কাউকে বলবেন না। আমার দাদাকেও না, অবশ্য আমিও জানি এ অনুরোধটুকু আপনি রাখবেন। এই আধঘণ্টার দেখায়ই আমি তা বুঝতে পেরেছি।'

জিতেন হেসে বলল, 'আমার ওপর তো আপনার ভারি ভরসা। কিন্তু কথাটা কী?'

শীলা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'বিয়ে আমি করব না, করতে পারব না।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল জিতেন, তারপর ম্লান হেসে বলল, 'বাধাটা কিসের? আমার বয়সের না তো?'

দৃঢ় গলায় শীলা বলল, 'না।'

জিতেন উকিল মানুষ, আরও খানিকটা জেরা করতে পারত, কিন্তু জেরা করে লাভ নেই। শীলার গলা শুনেই সে বুঝতে পেরেছে এটা ওর খামখেয়ালের কথা নয়। ভেবেচিন্তে মন স্থির করেই শীলা একথা বলছে আর স্কুল-কলেজে-পড়া ওসব মেয়েদের এই ধরনের অসম্মতির পিছনে একটিমাত্র ইতিহাসই লুকানো থাকে। জিতেনের তা অজানা নেই, জিতেন সে খোঁচাটা না দিয়ে ছাড়ল না। বলল, 'তা হলে বলুন, পাত্র আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। অজিত সে কথা আমার কাছে চেপে না গেলেই পারত।'

কিছুই ঠিক নেই, কেউই ঠিক হয়ে নেই। কিন্তু সেকথা জিতেনকে বলে কী লাভ। জিতেন কি তা বুঝতে চাইবে, না বিশ্বাস করবে? শীলা তাই চুপ করে রইল।

জিতেন আগের কথার জের টেনে বলল, 'অবশ্য অজিতটা চিরকালই ঐ প্রকৃতির। সবার ওপরই গায়ের জোর চালাতে চায়, কিন্তু বোঝে না সেদিন নেই আজকাল, দিন বদলে গেছে। বিয়ে-টিয়ের হাঙ্গামা না তুলে ও যদি দু'শোটা টাকা আমার কাছে ধার চাইত, আমি কি না করতাম?'

শীলা চমকে উঠল, 'দাদা আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে?'

জিতেন বলল, 'ও কিছু নয়, অজিত যেন ওর জন্যে ভাবে না। যখন পারে দেবে। ধার-দেনা কি আমরাই করি না। করি, আবার শোধ দেই। সেজন্যে ওকে ভাবতে হবে না।'

জিতেন আর কথা না বাড়িয়ে হাত তুলে একটা বাস থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল।

ফিরে আসতে আসতে শীলা ভাবল, দেনা হয় আবার শোধ হয় ঠিকই। কিন্তু ধার শোধ হতে যখন দিনের পর দিন দেরি হতে থাকবে

তখন পাওনাদারের ঔদার্য থাকবে কোথায়। অজিতের যা রোজগার তাতে সংসারের খরচই কুলোয় না, দেনা শোধ হবে কী করে। শীলার মনে পড়ল অজিতের কথাগুলো। এখন বুঝতে পারল ওর মঙ্গলের সাথে সংসারের মঙ্গল কোনদিক থেকে জড়িয়ে আছে। বিকেলবেলা অজিত যে ওর সব ভাবনা নিজে নিতে চেয়েছিল তার সবটুকুই তাহলে সত্যি নয়। তার মধ্যেও ভেজাল আছে। আজকের ঘটনায় শীলার সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

জিতেন অনুরোধ রেখেছে শীলার। পরদিন ছোট্ট একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে বিয়েতে তার অমতের কথা। সেই সঙ্গে একটু রসিকতাও করেছে। অজিতকে জানিয়েছে, আরেকটু বেশী বয়সের পাত্রী হলে ভালো হয়। বয়সের ডিসপেয়ারিটি কি ভালো? জিতেনের কাছে অদ্ভুত একধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ করল শীলা। আর ভাবল যেমন করে হোক ওর টাকাটা তাড়াতাড়ি শোধ করে দিতে হবে। অন্যের কাছে ধার করে হলেও শোধ দেবে। কিন্তু কার কাছে ধার করবে শীলা? একবার মনে পড়ল বিমলপ্রভার কথা। তাঁর কাছে হাত পাতবে কেমন করে। আর আছেন মণিকাদি। তাঁর কাছে ধার চাইলে কি তিনি ফিরিয়ে দেবেন? ধারই চাইবে। কারো দয়া-দাক্ষিণ্যে প্রয়োজন নেই। শুধু জিতেন দাসের নয়, দাদার দেনা, সংসারের দেনা, সব দেনা শোধ করে ও যেখানে খুশি গিয়ে থাকবে। এই ছোট সংসারের চার দেয়ালে কেবল ঠোক্কর খেয়ে ফিরতে পারবে না আর।

পরদিন সকালবেলাই শীলা মণিকাদির বাসায় গিয়ে উঠল। কী একটা ছুটির দিন। মণিকাদির কলেজের তাড়া নেই, স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছিলেন। শীলাকে দেখে মণিকাদি বললেন, 'এস,

তোমার কথাই ভাবছি কাল থেকে। এসে ভালো করেছ, একটা চিঠি লেখার দায় থেকে বাঁচা গেল, নইলে আজই তোমাকে একটা চিঠি ছাড়তে হত।'

ব্যাপারটা তারপর মণিকা খুলেই বলল। শীলা অনেকদিন ধরেই একটা চাকরির উমেদারি করছিল মণিকাদের কাছে কিন্তু ঠিক পছন্দমত চাকরি কিছুতেই তারা জুটিয়ে দিতে পারছিল না। মণিকার স্বামী খুঁজেপেতে যাও একটা ঠিক করে দিয়েছিল তাও তো বেশীদিন রইল না। অফিসসুদ্ধই গেল উঠে। এতদিন বাদে আরেকটি চাকরির খোঁজ পেয়েছে মণিকা। নেবে কিনা শীলা ভেবে দেখুক।

শীলা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল 'কী চাকরি মণিকাদি ?'

মণিকা হেসে বলল, 'মাস্টারি, যা আমাদের ভালো পোষায়, যা আমরা করতে পারি, তাই।'

শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ?'

মণিকা বলল, 'গোবিন্দপুরে, তবে একেবারে ধূ ধূ গোবিন্দপুরে নয়। হুগলী জেলায়, কলকাতা থেকে মাইল চল্লিশের মধ্যেই।'

খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করে জেনে নিল শীলা। না-গ্রাম না-শহর একটা জায়গা। রেলস্টেশন থেকে মাইল তিনেকের মধ্যে। হাসপাতাল আছে, পোস্ট অফিস আছে। একেবারে গণ্ডগ্রাম নয়। সেখানকার একটা নতুন মেয়ে-স্কুলে মাস্টারির চাকরি, হেড মিস্ট্রেস হয়ে যিনি গেছেন সেই সুলেখা নাগ মণিকাদির বান্ধবী। তাঁর মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছে। থাকবার কোয়ার্টার তারা দেবে। মাইনে কিন্তু বেশী নয়, মাত্র ষাট টাকা।

বিবরণ শেষ করে মণিকা বলল, 'তা হলে তুমি ভেবে দেখ, যাবে কি যাবে না। অবশ্য ভাবার সময় বেশী নেই। এই সপ্তাহের মধ্যেই ওদের জানিয়ে দিতে হবে। স্কুলের পড়াশুনা আরম্ভ হয়ে গেছে কিনা।'

শীলা হেসে বলল, 'ভাববার জন্ত আমার মোটেই সময় নিতে হবে না মণিকাদি, আমি কথা দিচ্ছি যাব। আপনি সেই হেডমিস্ট্রেসকে লিখে দিন।'

মণিকা একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু তোমার মার তোমার দাদার মত তো একবার নেওয়া দরকার। তাঁরা কি রাজী হবেন?'

শীলা বলল, 'তাঁদের রাজী করাবার ভার আমার।'

মনে মনে ভাবল তাঁরা রাজী হোন কি না হোন শীলার তাতে কিছু এসে যায় না। শীলাকে যেতেই হবে। কিছুদিনের জন্মে অস্তত এই চার-দেয়াল-ঘেরা সংসারের বাইরে গিয়ে সে নিশ্বাস নেবে। মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে, যেখানে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, কোন পরিচিত মানুষের মুখ নেই, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্মে ঐ ধরনের একটি গোবিন্দপুরেরই দরকার শীলার। আরো দূরে যেতে পারলে ভালো হত, আরও অনেক দূরে। যাওয়ার আগে মণিকাদিকে আর একবার জানিয়ে গেল শীলা যে সে সব স্থির করে ফেলেছে, সে যাবেই। মণিকাদি যেন স্কুলের কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে দেন।

বাড়িতেও জানিয়ে দিল। প্রথমে জানল জ্যোৎস্না, তারপর তার কাছ থেকে শুনল অজিত। মনোরমারও কিছু শুনতে বাকি রইল না, মেয়ে শহর ছেড়ে কোন এক পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছে মাস্টারি করতে। রাগে ত্বঃখে প্রথমে মনোরমা ভাবলেন কোন কথা বলবেন না, করুক যার যা খুশি, কিন্তু কথা না বলে থাকতে পারলেন কই; মেয়ে যখন সত্যি গোছগাছ শুরু করল তখন মনোরমাকে গিয়ে দাঁড়াতেই হল সামনে, ইচ্ছা হল শীলার সমস্ত জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা শীলা, তুই কী ভেবেছিস বল দেখি?'

শীলা মুখ তুলে বলল, 'কী আবার ভাবব। কিছু একটা করতে তো হবে।'

মনোরমা মুখ ভেংচে বললেন, 'কিছু একটা করতে তো হবে, তাই বলে তুই সেই অজ পাড়াগাঁয়ে যাবি চাকরি করতে। ভূ-ভারতে তোর আর কোথাও জায়গা হল না।'

শীলা বলল, 'গোবিন্দপুর তো বেশি দূরে নয়, তাও ভূ-ভারতের মধ্যেই।'

মেয়ের সঙ্গে মনোরমা যে পেরে উঠবেন না তা তিনি আগেই জানতেন। বেশি কথা কাটাকাটি না করে অজিতের ঘরে গিয়ে তিনি বললেন, 'আচ্ছা তুই কি চেয়ে চেয়ে তামাসা দেখবি না কিছু বলবি ?'

অজিত বলল, 'আমি অনেক বলেছি মা, আর বলে কোন লাভ নেই।'

মনোরমা বললেন, 'লাভ নেই ! তোর কথা শুনলে মরা মানুষের গায়ে রাগ ধরে। আরে কপাল-পোড়া, বোনটা যদি এমন করে ঘরের বাইরে চলে যায় তা হলে লোকে যে তোর গায়েই থুথু দেবে।'

অজিতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সেও চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'দেয় যদি দেবে। সে আমি বুঝব। তুমি যাও দেখি মা, এখান থেকে যাও এখন।'

মনোরমা বললেন, 'শুধু এখান থেকে কেন, একেবারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারলেই এখন বাঁচি। কিন্তু যম তো আর চোখে দেখে না।'

একটু বাদে অজিত নিজেই বোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শীলা তখন স্যুটকেশে শাড়ি-ব্লাউজগুলি ভাঁজ করে রাখছিল। অজিত একটুকাল সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তা হলে তুই কি সত্যিই যাবি ঠিক করলি ?'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ দাদা।'

অজিত বলল, 'তুই কারো কথাই শুনবিনে, কারো অনুরোধই রাখবিনে। সেই স্কাউণ্ড্রেলটার জন্যে—'

কথা শেষ করতে পারল না অজিত।

শীলা বাধা দিয়ে বলল, 'দাদা!'

সেই আহ্বানের জবাবে অজিত হঠাৎ কোন সাড়া দিতে পারল না, চুপ করে রইল।

শীলা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এ সব কথা বলতে তোমার লজ্জা করা উচিত দাদা, তুমি যদি নিজে নিজের মর্যাদা না রাখো আমার সাধ্য কি তোমার সম্মান আমি রাখব।'

অজিত আস্তে আস্তে বলল, 'তুই কী বলতে চাস?'

শীলা বলল, 'আমি আগেও যা বলতে চেয়েছি, এখনও তাই বলছি। তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছিনে। সংসারকে দু-পাঁচ টাকা সাহায্য করবার জন্যেই বাইরে যাচ্ছি। কলকাতায় যদি কোন কাজ-কর্ম জোটে খবর দিও, আবার এখানে চলে আসব। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'একা থাকতে চাস থাকবি, তাতে বাধা দিচ্ছে কে।' বলে খানিকটা বিরক্তি আর অভিমানের সঙ্গেই সেখান থেকে সরে গেল অজিত।

তখনকার মত সুটকেশ গোছানো বন্ধ করে শীলা একটুকাল চুপ করে রইল। দাদা ভেবেছে ব্যর্থ প্রণয়ের জন্যেই শীলা বিবাগী হয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে। যার যা ইচ্ছে ভাবুক। শীলা তো জানে এ সব কথার কিছুই সত্য নয়। সেদিনও তো বিদ্যাপীঠের সেই অনুষ্ঠানে

সুকুমারের সঙ্গে শীলার দেখা হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে শীলাও গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। স্টেজের নেপথ্যলোকে তার ডাক পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অভিশপ্ত কবিতাটির নৃত্যরূপ দেওয়া হয়েছে। দুটি ছোট ছোট মেয়ে নাচবে নেপথ্য থেকে, শীলাকে আবৃত্তির অংশটুকু বলে যেতে হবে। গিয়ে দেখে সুকুমারও সেখানে একজন পাণ্ডা। ঘোষণার কাজ সেই করছে, শুধু দেখাই হয়েছিল, কথা হয় নি। কেউ কথা বলবার কি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে নি। এমনভাবে তারা সেখানে উপস্থিত ছিল যেন একজনের সঙ্গে আরেকজনের পরিচয় নেই। নিজের কথাটুকু শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ফাংশন থেকে চলে এসেছিল শীলা। কারো অনুরোধেই সে বিন্দুমাত্র দেরি করে নি, শুধু লক্ষ্য করেছিল মাইকের সামনে আবৃত্তিকারিণী শীলার নামটা ঘোষণা করতে যেন গলাটা ধরে এসেছিল সুকুমারের, আর কিছু নয়।

অফিসে বেরোবার আগে অজিতের হঠাৎ মনে হল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, বিমলপ্রভাকে একবার খবরটা দিয়ে দেখতে পারে অজিত। সুকুমারের ওপর শীলার বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা থাকলেও তার মাকে এখনও সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তিনি যদি বলে-কয়ে শীলাকে নিরস্ত করতে পারেন।

অবশ্য ও বাড়িতে যেতে অজিতের আত্মসম্মানে বাধে। যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে, যে সব ব্যবহার ওরা করেছে তাতে অজিতের আর ওমুখো হওয়া উচিত নয়। তবু নেহাত মার কথা ভেবেই অজিত গোবরা রোডের দিকে পা বাড়াল।

খবর শুনে বিমলপ্রভা একটুকাল চুপ করে রইলেন। এ ভালো হল। এদিকে ছেলেও বাইরে যাওয়ার জন্যে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করেছে,

মাঝখানে শুধু একটি দিন। পরশু ভোরের ট্রেনে যাত্রা করবে সুকুমার। ওদিকে শীলাও চলে যাচ্ছে। তুজনেরই তো হাওড়া স্টেশন। যেতে যেতে তুজনের যদি দেখা হয়ে যেত, বোঝাপড়া হত নিজেদের মধ্যে, সব ভাবনার দায় থেকে রেহাই পেতেন বিমলপ্রভা। কিন্তু তিনি জানেন তা হবার নয়, এক পথে গেলেও তুজনে এগোবে তুই সমান্তরাল রেখা ধরে যাতে কারো সাথে কারো দেখা না হয়, কথা বলতে না হয়। সেদিনের ফাংশন উপলক্ষে ওদের তুজনের যে দেখা হয়েছিল সে খবরও তাঁর কানে এসেছে, কিন্তু একজন নাকি আরেকজনকে এড়িয়ে গেছে। বিমলপ্রভা নিজের মনেই একটু হাসলেন। অভিমান। অভিমান করে একজন আরেকজনের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, দূরে চলে যেতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না তাতে লাভ নেই। সুকুমারের এই যে লাইব্রেরি-ক্লাব নিয়ে মাতামাতি এর মধ্যে কি ফাঁকি নেই? বিমলপ্রভা লক্ষ্য করেছেন, ছেলে তাঁর তুদিনেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা তো মুখে স্বীকার করবে না। সেদিন সুকুমার এসে বলেছে, 'না মা, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরেই আসি, অনর্থক ছুটির দিনগুলোকে মাঠে মেরে লাভ নেই।' বিমলপ্রভা অলক্ষ্যে মুখ টিপে হেসেছেন, বলেছেন, 'তাই যা, শরীরটাও একটু সারবে তাহলে।' ঘরের ভিতর ডেকে এনে বিমলপ্রভা অজিতকে বসালেন, তারপর বললেন, 'আমাকে যেতে বলছ, কিন্তু তোমাদের কারো কথাই যখন মানছে না, তখন আমার কথাই বা শুনবে কেন।'

অজিত বলল, 'সে সন্দেহ যে আমারও নেই তা নয়। শীলা যে কি রকম জেদী মেয়ে তা তো জানি। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। আপনার কথা যদি শোনে।' তারপর একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'অবশ্য আমি ওকে মোটে বাধাই দিতাম না। বাধা দিয়ে

[illegible] থাকছে না। পরশু সে ছুটিতে বাইরে চলে যাচ্ছে। আর তুমি [illegible] জান দায়িত্বের মধ্যে সে কোনদিনই নেই।'

বিমলপ্রভা কাছে এসে শীলার হাত ধরলেন, বললেন, 'তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

সুকুমার চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সুকুমার? সত্যি কি সে কেবল ছুটি কাটাতেই বাইরে যাচ্ছে? না আর কোন উদ্দেশ্য আছে? হয়তো বিমলপ্রভা তা জানতে পারেন নি, কিন্তু কেন যাবে সুকুমার? শীলা আস্তে আস্তে বলল, 'বেশ, অন্য মিস্ট্রেস ঠিক না করা পর্যন্ত আপনার স্কুলের ভার আমি নিলাম মাসিমা।'

বিমলপ্রভা খুশী হয়ে শীলার চিবুক স্পর্শ করে আঙুলে চুমু খেয়ে বললেন, 'জানি মাসিমাব কথা শীলা না রেখে পারবে না।' অজিত আর তার মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বিমলপ্রভা রিকশাওয়ালাকে ডেকে বললেন, 'আমাকে একটু গোবরা রোডের মোড়ে ফেলে দিয়ে আয় বাবা, হাটাহাঁটি করে আর পারি না।' বিমলপ্রভা রিকশায় উঠে বসলেন।

মনোরমা তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ছলছল চোখে বললেন, 'এতদিন আপনাকে মিথ্যেই দোষারোপ করেছি দিদি। আপনি যা করলেন—'

বিমলপ্রভা মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন, 'করা-কাটাই আমাদের এখনও অনেক বাকি আছে দিদি। আমার কর্তাটি তো নামেই কর্তা। তাঁকে দিয়ে আমাকেই সব করিয়ে নিতে হয়। পুরুত ডেকে দিন ঠিক করে তাড়াতাড়ি কোন রকমে এখন দু হাত মিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। তারপর—'

আর কি বলতে যাচ্ছিলেন বিমলপ্রভা। কিন্তু রিকশাওয়ালা ছুটতে শুরু করায় তিনি হাসির মধ্যেই বাকি কথাটুকু শেষ করলেন।